লক্ষ্মীপুরে যারা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক

হোসাইন আহমদ ভূঁঞা

লক্ষ্মীপুরে যারা
ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক

হোসাইন আহমদ ভূঁঞা

লক্ষ্মীপুরে যারা
ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক

হোসাইন আহমদ ভূঁঞা
বি.এস.সি, বি.এড

প্রকাশক ঃ
মোঃ রুহুল আমিন ভূঁঞা

প্রকাশকাল ঃ
জানুয়ারী -২০১৪
পৌষ -১৪২০
রবিঃ আউয়াল -১৪৩৫

মূল্য- ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা।

কম্পোজ ঃ কামাল হোসেন

প্রচ্ছদ ঃ রাসেল মাহমুদ সৈকত

www.pathagar.com

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদের শেষ লেখা

সৃষ্টির জন্ম লগ্ন থেকে আদম (আ) হতে শুরু করে যুগে যুগে নবী রাসুলগণ ইকামতে দ্বীনের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এর পর রাসুল হিসেবে দুনিয়াতে আর কেউ আসবেনা। কারণ রাসুল (সা) হচ্ছেন খাতেমুন নাবিয়ীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন।

রাসুল (সা) এর আহবানে সাড়া দিয়ে যারা দ্বীনের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের ঘোষণা "ঐ সব মুহাজির ও আনসার যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াতের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবেন। এটাই বিরাট সফলতা"। সূরা তাওবা-১০০

এ ভাবে সাহাবায়ে আকরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, বিভিন্ন ঈমামগণ, মুজাদ্দেদে আল ফেসানী, শাহওয়ালি উল্লাহ, শহীদ হাসানুল বান্না, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) সহ বহু অগ্রপথিকের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিভিন্ন জেলায় যারা ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের অনেকের নাম আমাদের অজানা রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা তাদের জীবন বৃত্তান্ত জানতাম তাহলে আমরাও অনুপ্রেরণা লাভ করতাম। আর সে অভাবই পূরণ করার চেষ্টা করেছেন জনাব হোসাইন আহমদ ভূঁঞা। তাই আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুতরাং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবন বাজী রেখে রক্তের বিনিময়ে কোন ভূখন্ডে বা এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক হিসাবে কুরবাণী পেশ করেছেন, তাদের জন্য আমরা পরবর্তিরা দোয়া করছি। "হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিন, যারা আমাদের পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বড়ই মেহেরবান ও দয়ালু।" সূরা হাসর আয়াত-১০

যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য রক্ত দিয়েছেন তুমি তাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানাও। তাদের আদর্শ অনুযায়ী তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে আমাদেরকে কুরবাণী পেশ করার জন্য তাওফিক দান করুন। আমিন!

www.pathagar.com

ভূমিকা

লক্ষ্মীপুরের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে যারা কুরআনের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করার সাহস, উদ্যম, দৃঢ়তা এবং উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছেন, ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন এবং দেশ ও সমাজের অনেক পরিবর্তন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে গেছেন। তাদের ত্যাগ ও কুরবাণী সম্পর্কে আমাদের জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিকদের জীবনী নবাগত ভাইদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। এই আশাকে লালন করেই তাঁদের জীবনের ইতিবাচক দিক গুলোকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের সেই অগ্রপথিকদের কার্যক্রমকে স্মৃতিতে ধারণ করে যাতে আমরাও ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারি সেই চেষ্টা সাধনা করতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই **লক্ষ্মীপুরে যারা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক** "বইটি" প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ সুবহানাহুতালার দরবারে অবনত মস্তকে শুকরিয়া আদায় করছি।

আবু জেহেল আবু লাহাবের উত্তরসূরীরা ইসলামী আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে যাচ্ছে। চালিয়ে যাচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধ, অমানুসিক নির্যাতন, জেল, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, অপপ্রচার ও হত্যাযজ্ঞ। পঙ্গুত্ব, কারাবরণ, নির্যাতন ও সংকটের মোকাবিলা করে সাহসীকতার সাথে ইসলামী আন্দোলন দূর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করার কারণে বর্বোরচিত নির্যাতনের শিকার জামায়াতে ইসলামী ও শহীদি কাফেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মী যারা শরীরের সবটুকু রক্ত ঢেলে দিয়ে লক্ষ্মীপুরের মাটিকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য উর্বর করে গেছেন। দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে জীবন দিয়ে মালিকের সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ যারা করবে, তাদের জন্যই ইসলামী আন্দোলনের এই শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। বিশেষ করে কিভাবে তাঁরা শহীদ হলেন এই সামান্য লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরকালে নাজাতের জন্য আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান বিক্রি করে দিতে হবে। যার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। প্রকৃত পক্ষে জান ও মাল তারাই বিক্রি করে দিতে পারে যারা পরকালকে টার্গেট বানিয়ে নিয়েছে। এর

www.pathagar.com

স্বীকৃতি মুখে বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন খুবই কঠিন। ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকেই আল্লাহর মেহেরবাণীতে এই কুরবাণীর সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ক্ষনিকের জন্য এই সাক্ষ্য না হয়ে পুরোজীবনের জন্য এই পথের অনুসারী হলেই পরকালের নাজাত সম্ভব। তাই সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিকদের চেষ্টা সাধনা, শহীদদের জীবন দান ও গাজীদের রক্ত ক্ষরণের মাধ্যমে দ্বীনের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি।

তথ্যগত অথবা অন্য কোন ভুল থাকতে পারে, সে জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে গ্রহন করবো। পুস্তিকাটি প্রকাশে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি, আল্লাহ তাদেরকে যাযা দান করুন। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে পরকালের নাযাতের জন্য কবুল করুন। আমিন!

হোসাইন আহমদ ভূঁঞা

"ইসলামী আন্দোলনের পথে মালের কুরবানীর ওয়াদা করা ও ওয়াদা পূরণ করতে দেরী করা আমার কাছে অসহনীয়"-

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র ঃ

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদের শেষ লেখা	৩
ভূমিকা ঃ	৪
অগ্রপথিক যারা ঃ	৭-২৭
১। মরহুম মাষ্টার মোঃ সফিক উল্লাহ	৭
২। মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী	১২
৩। মরহুম ক্যাপ্টেন এবিএম আবদুর রহমান	১৫
৪। মরহুম সফি উল্লাহ ভূঁইয়া	১৮
৫। মরহুম আবুল বাসার মিয়া	২০
৬। মরহুম অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল জাব্বার	২৩
৭। মরহুম মাষ্টার সিরাজুল হক	২৬
শহীদ হলেন যারা ঃ	২৮-৫২
১। শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ	২৮
২। শহীদ মোঃ নূর উদ্দিন	৩৫
৩। শহীদ ফজলে এলাহী	৩৭
৪। শহীদ আহমদ যায়েদ	৪০
৫। শহীদ কামাল হোসেন	৪৪
৬। শহীদ মাহমুদুল হাসান	৪৬
৭। শহীদ এ.এফ.এম মহসীন	৪৯
গাজী হলেন যারা ঃ	৫৩-৭২
১। মাওলানা মোঃ মহিব উল্লা	৫৩
২। মাষ্টার মোঃ মমিনুল হক	৫৫
৩। মুহাম্মদ ওমর ফারুক	৫৭
৪। মাওলানা জহিরুল ইসলাম	৬০
৫। মুহাম্মদ শামছুল ইসলাম	৬৩
৬। মাওলানা সফিকুল ইসলাম	৬৫
৭। মুহাম্মদ নুরুন নবী	৬৮
৮। ইয়াতিম শামছুল ইসলাম	৭০

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মরহুম মাষ্টার মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ্

আদর্শিক চেতনায় নিবেদিত প্রাণ

লক্ষ্মীপুরের মাটি ও মানুষের সাথে যে নামটি জড়িত তিনি হচ্ছেন আলহাজ্জ মাষ্টার মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ। লক্ষ্মীপুর থানা থেকে লক্ষ্মীপুর মহকুমা,লক্ষ্মীপুর মহকুমা থেকে লক্ষ্মীপুর জেলা এসবই যেন মহান ব্যক্তিত্ব সফিক উল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টার ফল। নারিকেল, সুপারির ছায়া ঘেরা লক্ষ্মীপুরে তাঁর নামটি কালের স্বাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পাতায় চিরকাল লিখা থাকবে। চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে কাছে নিয়ে আসে, অনুরূপ ভাবে এলাকার গরীব-দুঃখি মানুষ, জ্ঞানী-গুনি ব্যক্তি, ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মী তাঁর কাছে এসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। তিনি ছিলেন সদালাপী তেমনি জ্ঞানের খোরাক দিয়ে সকলকে করতেন সমৃদ্ধ। অনেক সময় তাঁর সান্নিধ্যে এসেও যেন অতৃপ্তি থেকে যেত। সময়ের টানে চলে যেতে হতো, হাসিমুখে বিদায় দিতেন সকলকে। আবার দেখা হবার আশাবাদ ব্যক্ত করে কর্মস্থলে চলে যেতেন ভক্তরা।

বাংলাদেশে যারা ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মরহুম আলহাজ্জ মাষ্টার মোঃ সফিক উল্লাহ। পাকিস্তান আমল থেকে প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কঠিন পরিবেশে ও তিনি জনগনের সাথে মিলেমিশেই দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এমনকি ঐ সময়ের সাহসী ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে যারা ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

জন্ম ও শিক্ষা

এই ক্ষনজন্মা মানুষটি ১৯২৮ সালে লক্ষ্মীপুর জিলা শহরের বাঞ্চানগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ মুহাম্মদ রৌশন আলী পন্ডিত। তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলের শিক্ষক। লক্ষ্মীপুর শহরে পন্ডিত বাড়ি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। মুহাম্মদ রৌশন আলী পন্ডিত লক্ষ্মীপুর হাই স্কুল, দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঈদগাহ ও বহু মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

জজ কোর্টের জুরার। লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন সামাজিক ও ইসলামী কাজে বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা ছিল তাঁর। মুসলিম লীগের আন্দোলনের সাথে জড়িত থেকে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন।

মাষ্টার মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ যোগ্য পিতার তত্বাবধানে বাঞ্চানগর গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ১৯৫০ সালে ৯ম স্থান অধিকার করে হাই মাদরাসা পাশ করেন। লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজ থেকে ১৯৫২ সালে চতুর্থ স্থান লাভ করে আই.এ পাশ করেন। একই কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে।। পরে তিনি বি.এড ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ সরকারি চাকুরী অথবা আর্থিক দিক থেকে উন্নতির কথা চিন্তা না করে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজেকে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করেন। তিনি প্রথমে পালপাড়া হাই স্কুল ও এরপর মান্দারী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মান্দারী হাই স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতাপগঞ্জ হাই স্কুলে ইংরেজীর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি চন্দ্রগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলেন। সর্বশেষ লক্ষ্মীপুর হেড কোয়াটারের ঐতিহ্যবাহী এইচ.এ.সামাদ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। একজন সফল শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। ভাল ভাল ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ইসলামী আন্দেলনের প্রয়োজনে অবসর গ্রহণ করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের লক্ষ্মীপুর ইউনিটের নেতা ছিলেন। মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে সক্রিয় থেকে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি মাওলানা মওদূদী (র) এর সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে পারেন। মাওলানা মরহুমের তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমেই ইসলামের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন। ১৯৬১ সালে রুকনিয়াতের (সদস্য) শপথ গ্রহন করেন। এবছরই তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আমীর নিযুক্ত হন। তিনি যোগ্যতার সাথে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক মজলিশে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীর ছিলেন। পাকিস্তান জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য ছিলেন। তিনি শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। শ্রমিকদের ইসলামী আন্দোলনের এই কঠিন কাজ তিনি সফলতার সাথে পালন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন পরিচালক ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব ও পালন করেন। মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ ১৯৭৯ সালে ইসলামীক ডেমোক্রেডিক লীগ বা আই,ডি,এল এর প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনী এলাকায় রাস্তাঘাট তৈরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও পূনর্বাসনে যথেষ্ট সুনাম অর্জনে সক্ষম হন। ১৯৬৫ সালে আইয়ূব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। এজন্য আইয়ূব সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি ৩ মাস কারা বরণের পর মুক্তি লাভ করেন। তিনি বৃহত্তর নোয়াখালীতে ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ অঞ্চলে যারা ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মী তারা সকলেই মাষ্টার সফিক উল্লাহর হাতেই সবক নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সমাজ সেবা

মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ একজন সমাজ সেবক ছিলেন। বন্যা, টর্নেডো সহ সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগে জনগনের পাশে দাঁড়াতেন। তিনি দিনের পর দিন পায়ে হেটে দুঃখী মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিতেন। যারা তাঁর সাথে থাকত তারা ক্লান্ত হয়ে যেত। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে ও হেটে তাঁর যেন কোন ক্লান্তি ছিলনা। নিরলস ভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। সাধ্য পরিমান সাহায্যের চেষ্টা করতেন। তিনি অনেক মসজিদ, মাদরাসা, ক্লাব ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ঢাকা জামেয়া কাসেমিয়া আলীয়া মাদরাসার সহসভাপতি ছিলেন এবং হায়দরগঞ্জ (রায়পুর থানা) রহমতে আলম মাদরাসা ট্রাষ্টের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লক্ষ্মীপুর কলেজ, লক্ষ্মীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সরকারী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অবদান রয়েছে। লক্ষ্মীপুর মডেল হাইস্কুল ও লক্ষ্মীপুর সামাদ একাডেমীকে একত্রিত করে "লক্ষ্মীপুর এ এইচ এ সামাদ একাডেমী" নামে সরকারী করেন। জনাব সফিক উল্লাহ সাহেব প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দিয়ে লক্ষ্মীপুর থানাকে মহকুমায় উন্নীত করেন। পরিবর্তীতে সকল মহকুমা জেলা হয়ে যায়। ফলে ১৯৮৪ সালে লক্ষ্মীপুর ও জেলা হয়ে যায়। তিনি এম পি থাকা অবস্থায় তাঁর প্রচেষ্টায় রামগতি-লক্ষ্মীপুরের পঞ্চাশ কি.মি. রাস্তা পাকা হয়। তিনি লক্ষ্মীপুর হেড কোয়ার্টার এর সাথে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সংযোগ রাস্তা ও পুল নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগের উন্নতি সাধন করেন।

মাষ্টার মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ লক্ষ্মীপুর দারুল আমান ট্রাষ্ট গঠন করেন। এই ট্রাষ্টের মাধ্যমে দারুল আমান ইয়াতিমখানা ও মাদরাসাই দারুল আমান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নে সভাপতি হিসাবে যোগ্যতার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নিরলশ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশ থেকে অর্থ কালেকশন করে এবং মুসলিম এইডের অর্থায়নে বিরাট আকারের ৩ তলা ভবন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যা কালের সাক্ষী হিসাবে তাঁর স্মৃতি বহন করবে চিরদিন। সরকারী অনুদানে একটি দোতলা ভবন ও একটি একতলা ভবন নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসায় প্রায় ছয়শত ছাত্রছাত্রী পড়া লেখা করছে। বিগত বছরগুলোতে ভাল ফলাফল লাভ করে লক্ষ্মীপুর জেলায় সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় আলিম পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি পেয়েছে।

সাহিত্য কর্ম

তিনি শুধুমাত্র একজন রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বই নন, তিনি একজন লেখক ও বটে। তাঁর লিখিত বই এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

১। জাগো মুসলিম জাগো ২। বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ
৩। একটি আদর্শ পরিবার (তিন হিজরত, তিন শাহাদাত)
৪। আদর্শিক চেতনার বিকাশ ৫। জ্ঞানের আলো।

দেশ ভ্রমন

জনাব মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ দু'বার হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে পাকিস্তান ও লন্ডন সফর করেন।

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন

তিনি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সামছুন্নাহার। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি ৫ ছেলে ৩ মেয়েকে আদর্শিক মানে গড়ে তোলেন। কখনো আর্থিক অভাব অনটন,আবার কখনো আন্দোলনের কঠিন পরিস্থিতিতে এক ধৈর্য্যশীলা মহিলা হিসেবে পুরো জীবনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। একবার সফিক উল্লাহ সাহেবের দূরবর্তী স্থানে নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল। তিনি প্রোগ্রামে রওয়ানা দিবেন এ সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। এ অবস্থায় কী করবেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলেন সফিক সাহেব, "আমি কী প্রোগ্রামে যাবো?" জীবন-মৃত্যুর এ সন্ধিক্ষনেও প্রসূতি প্রোগ্রামে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সফিক সাহেব প্রোগ্রামে চলে গেলেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রতি কতটুকু আন্তরিকতা ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল থাকলে এ ধরনের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা যায়। এভাবে অগনিত উদাহরণ তাঁদের জীবনে রয়েছে। যে কারণে জনাব মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ সাহেব স্ত্রীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতার কারণে আন্দোলনের কাজে স্বস্তি বোধ করতেন। সফিক সাহেবের মৃত্যুর নয় বছর পূর্বে তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। তার ৫ ছেলে ও ৩ মেয়ে রেখে গেছেন। বড় ছেলে জনাব মোয়াজ্জেম হোসাইন সফিক উল্লাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ট্রাষ্ট,মাদরাসা ও ইয়াতিমখানা পরিচালনা করছেন। মেঝো সন্তান এডভোকেট ইসমাইল হোসেন বেলাল বিশিষ্ট আইনজীবি। তিনি বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ছিলেন। মাত্র ৫৫ বয়সে তিনি ৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। তৃতীয় ছেলে মোঃ ইব্রাহিম হোসাইন খালেদ ঢাকায় থাকেন। চতুর্থ ছেলে মাওলানা তারেক মনোওয়ার হোসাইন প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হিসেবে সারা বাংলাদেশে পরিচিত। ছোট ছেলে আকরাম হোসাইন মুজাহিদ একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। বড় জামাতা মাষ্টার মনির আহমদ শহীদ আহমদ জায়েদের পিতা। যার পিতা ও বড় ভাই শাহাদাত বরণ করেন। মেঝো জামাতা প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আবদুল কাউয়ুম স্বপরিবারে লন্ডনে থাকেন। তিনি ইস্ট লন্ডন জামে মসজিদের খতিব ও পিস টিভির আলোচকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করছেন। ছোট জামাতা ডাঃ ইহতেশামুল হক শাহীন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য।

www.pathagar.com

ইন্তেকাল

২০০৫ সালের ২৫ আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিটে মগবাজারের বাসায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এ অজ্ঞান অবস্থায় তাৎক্ষনিক তাঁকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার তাকে পরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামী আন্দোলনের এক সাহসী ব্যক্তিকে হারাল। আর এলাকাবাসী হারাল একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবককে। যে স্থান আর কোনদিন পূরণ হবার নয়। তাঁর সর্বোচ্চ জান্নাত কামন করছি। আমিন!

মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী

আদর্শিক চেতনার মূর্তপ্রতীক

ইসলামী আন্দোলনের অনেক সংগ্রামী মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস পড়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথীরা উজ্জীবিত হয়ে থাকে। মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী তাদেরই একজন। তাঁর জীবনের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করলে বর্তমান ইসলামী আান্দোলনের সংগ্রামী কর্মীরা উৎসাহিত হতে সাহায্য করবে। তিনি ছিলেন দ্বীন কায়েমের পথে নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সৎ, সাহসী, সমাজসেবী ও দেশপ্রেমিক।

জন্ম ও পরিবার

জনাব আবুল কাশেম চৌধুরী ১৯২৬ সালে সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন সম্ভ্রান্ত মুসলীম জমিদার পরিবারের সন্তান। বর্তমানে তাঁর এলাকাটি লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত। তিনি জমিদার পরিবারের লোক হলেও সাধারণ মানুষের সাথে মিলে মিশে চলতে কোন প্রকার দিধা করতেন না। তাঁর স্ত্রী ও ছিলেন অন্য একটি জমিদার পরিবারের সন্তান। মেহমানদারিতে উভয়ই ছিলেন অসাধারণ। চৌধুরী সাহেবের বাসায় এসে আপ্যায়ন না করে বিদায় নেয়া ছিল অসম্ভব। তিনি ছয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জনক। বর্তমানে পাঁচ ছেলে ঢাকায় থাকেন। এক ছেলে আবদুল গনি অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় সিডনী ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এক জামাতা মুহাম্মদ জাকির হুসাইন নোয়াখালী জেলা ইসলামী ছাত্র

www.pathagar.com

শিবিরের প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনৈতিক জীবন

আবুল কাশেম চৌধুরী আওয়ামী ছাত্র লীগে যোগদানের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। আন্দোলনের তরুন সৈনিক হিসাবে রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে থাকেন। এরপর তিনি ইয়থ ছাত্র লীগের বৃহত্তর নোয়াখালীর জেলা সহ সভাপতি ছিলেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানির উদ্যোগে আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনের বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। প্রথমে আওয়ামী মুসলীম লীগ ও পরবর্তিতে আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখেন। কিন্তু এক পর্যায়ে চৌধুরী সাহেব এই আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। উন্নত মানের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি এ ধরনের আন্দোলনে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। চৌধুরী সাহেবের জীবনে তাই ঘটেছিল।

ইসলামী আন্দোলনে ভূমিকা

আবুল কাশেম চৌধুরী এক পর্যায়ে বুঝলেন, মানুষের তৈরী মতবাদ দিয়ে মানুষের কল্যান সম্ভব নয়। ১৯৬০ সালে লক্ষ্মীপুরের কৃতি সন্তান মাষ্টার সফিক উল্লাহ, আবুল কাশেম চৌধুরীকে নিয়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে সাক্ষাত করেন। অধ্যাপক সাহেবের কথা শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আবুল কাশেম চৌধুরী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তৎপরতার সাথে ময়দানে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই জামায়াতের সদস্য (রুকন) হিসাবে শপথ করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ৬ বছর তিনি দক্ষতার সাথে লক্ষ্মীপুর জেলা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অথচ জেলা আমীর হওয়ার পূর্বে তাকে মাজুর ঘোষণা করার চিন্তা ভাবনা হয়েছিল। কিন্তু যোগ্যতা সম্পন্ন বিকল্প কোন লোক ছিলনা বলে চৌধুরী সাহেব জেলা আমীর নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৩ সালেই তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জেলার প্রত্যেক থানায় সংগঠন কায়েম হয়। মহিলা সংগঠনের ও কাজ শুরু হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে অন্যান্য বড় দলগুলোর কাছে তার যথেষ্ট মূল্যায়ন ছিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোন সংলাপ বা বৈঠকে চৌধুরী সাহেবের ভূমিকা বা বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হতো। এক কথায় টেবিল টকে তাঁর জুড়ি ছিলনা। তিনি বড় শিক্ষিত না হলেও উচ্চ শিক্ষিত লোক চৌধুরী সাহেবের যুক্তি পূর্ণ বক্তব্যের কাছে হার মানত। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকেই নিজের সংসারের জন্য তেমন কোন সময় দিতেন না। নিরলস ভাবে সংগঠনের কাজে সময় দিতেন। তিনি ছিলেন আন্দোলনের জন্য নির্ভিক ও নিবেদিত প্রাণ নেতা। সংগঠনের আমানতের সংরক্ষনে তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তি। সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন্টন করে তিনি তদারকের ভূমিকা পালন করতেন। ১৯৬৫ সালে লক্ষ্মীপুর বানীয়ে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এর আগমন উপলক্ষে গোহাটায় অনুষ্ঠিত জনসভার দায়িত্ব পালন করে একজন যোগ্য সংগঠকের পরিচয় দিয়ে ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে তিনি যে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মহান আল্লাহর দরবারে তার জন্য উত্তম যাযা কামনা করছি। আমার উপর (লেখক) জেলা আমীরের দায়িত্ব আসার পর সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। যখন আমি তাঁর নিকট যেতাম তখনই দিধাহীন চিত্তে সংগঠন পরিচালনায় আমাকে দিক নির্দেশনা দিতেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতেন অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে। সে দিক থেকে আমি মনে করি তিনি ছিলেন এক বড় মাপের রাজনৈতিক বিশ্লেষক। যে কোন বড় নেতার সামনা সামনি দোষ ত্রুটি তুলে ধরতে দিধা করতেন না। এক কথায় বলা যায় তিনি সত্যের পথে ছিলেন নির্ভিক।

সামাজিক কাজ

আবুল কাশেম চৌধুরী ইসলামী আন্দোলনের সাথে সাথে সামাজিক কাজেও সময় দিতেন। অসহায় মানুষের সেবা করা, গরীব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিপদে আপদে পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এগিয়ে যাওয়া, সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ সকল ভূমিকার কারণে তিনি ছিলেন একজন সমাজ নেতা। মানুষের কাছে শ্রদ্ধার

www.pathagar.com

পাত্র। তিনি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন। রিক্সা প্রকল্প, সেলাই মেশিন প্রকল্প ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইসলামী পাঠাগার, আল ইসলাম সোসাইটি গঠন করে সামাজিক কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করেছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয় গঠনের মাধ্যমে গরীব দুঃখী মানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনি লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও দারুল আমান একাডেমীর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লাহারকান্দি হাই স্কুল ও এনায়েত পুর মাদরাসার সহ সভাপতি ছিলেন। লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন। লক্ষ্মীপুর দারুল আমান ট্রাস্টের আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি।

মৃত্যুকাল

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে জনাব আবুল কাশেম চৌধুরী ৭৫ বছর বয়সে ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল দিবাগত রাত ৩.৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জানাযায় দল মত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন!

মরহুম ক্যাপ্টেন এ বি এম আবদুর রহমান

আখেরাতের ফিকিরে নিবেদিত প্রাণ

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

এ বি এম আবদুর রহমান লক্ষ্মীপুর জেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের মহেষখিল গ্রামের এক ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে ১৯৩০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হাজী আবদুল হামিদ। আবদুর রহমান সাহেব পিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তিনি দত্তপাড়া হাইস্কুলের হেড মাষ্টার, দত্তপাড়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মরহুম আবদুল ওয়াদুদ সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর উচ্চ শিক্ষিত দুই ভাতিজা জনাব আবুদল ওয়াহেদ ও জনাব খালেদ সাইফুল্লাহর সাথে ছিল আপন ছেলের মত প্রাণাধিক সুসম্পর্ক। যারা উভয়ই ইসলামী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও কর্মজীবন

তিনি ১৯৫৩ সালে ঐতিহ্যবাহী দত্তপাড়া হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। আবদুর রহমান শারীরিক দিক থেকে ছিলেন লম্বা গড়ন, সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। মেট্রিক পাস করার পর তিনি ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তিনি বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে সুবেদার মেজর পদে নিয়োজিত হন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নিত হন। সেই বছরেই বাংলাদেশ হজ্জ প্রতিনিধি দলের প্রধান হয়ে হজ্জ ব্রত পালন করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন

পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি এদেশের জনগনের উপর সুবিচার করেনি। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে ইসলাম ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল সরকারের অবস্থান। যে কারণে বৈষম্যের স্বীকার বাংলাদেশের জনগনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হয়েছে। তাই দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশ প্রেমিক হিসাবে ক্যাপ্টেন আবদুর রহমান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি লাহোর সেনানিবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালে তাবলীগ জামাতের বেশে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দুই নম্বর সেক্টরে তিনি লেঃ কর্ণেল জাফর ইমামের সাথে আর্মী সাফলাই কোরে কমান্ডার হিসাবে সুনামের সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেন।

সামাজিক কাজ

আবদুর রহমান সাহেব হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের পথে ছিলেন জলন্ত উদাহরণ। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তাঁর প্রমাণ মেলে। তিনি রংপুর, বগুড়াও নারায়ণগঞ্জ সেনানিবাসে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। চৌপল্লীতে জৈন পুরের পীর সাহেবের জন্য খানকা তৈরী করেন। তাঁর বাড়ির সামনে আয়েশা (রা) দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদরাসা আয়েশা কামিল মাদরাসায় উন্নিত হয়। এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্যে তিনি তাঁর জমি, সম্পদ ও শ্রম পরকালের জন্য বিনিয়োগ করে গেছেন। আল্লাহ তাঁর এই দানকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবন

তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি তাঁর ছিল মজবুত ঈমান। এ লক্ষ্য অর্জণে সঠিক পথের সন্ধানে তার মন ছিল সদা জাগ্রত। তাই তিনি ১৯৮৭ সালে ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে দেখা করে পরামর্শ চাইলেন। তাঁর পরামর্শের আলোকে তিনি মাষ্টার সফিক উল্লাহ সাহেবের সাথে দেখা করলেন এবং জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করলেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে লক্ষ্মীপুরে এসে জামায়াত ইসলামীর কাজ শুরু করেন। সম্ভবত ১৯৮৯ সালে তিনি সংগঠনের রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। শপথের মাধ্যমে তিনি তাঁর জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করে দেন জান্নাতের বিনিময়ে। সমস্ত শক্তি সামর্থকে তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করেছেন।

তাঁর যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও খুলুসিয়াতের কারণে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিধি বাড়তে থাকে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল লক্ষ্মীপুর সংগঠনের সকল স্তরেই। বিশেষ করে থানা পর্যায়ে যেখানেই নেতৃত্বের দুর্বলতা ছিল, সেখানেই তাকে দিয়ে সে অভাব পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি সদর পূর্ব, সদর পশ্চিম ও লক্ষ্মীপুর শহর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জেলা মজলিশে শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন। এক পর্যায়ে জেলা অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তখন থেকে প্রায়ই জেলা অফিসে থাকতেন। অফিসের নিকটবর্তী মসজিদে রাতের কত অংশ কাটাতেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। ফজরের নামাজ তিনি বিভিন্ন মসজিদে আদায় করতেন। নামায শেষে মুসল্লিদেরকে দ্বীন সম্পর্কে প্রাণবন্ত আলোচনা করতেন। দায়ী ইলাল্লাহের ভূমিকায় তিনি ছিলেন অকুতোভয় সৈনিক। হেঁটে হেঁটে তার পা ফুলে যেত। আমরা তাকে এ বয়সে এত পরিশ্রম করতে নিষেধ করতাম। আল্লাহর ভয়ে তার মন ছিল ব্যাকুল, আখেরাতের ফিকিরে তাকে তাড়িয়ে বেড়াত। খাওয়া- দাওয়া, আরাম-আয়েশকে পরিহার করে নফসকে দমন করায় তিনি হচ্ছেন বিরল দৃষ্টান্ত। তখন আমি (লেখক) তার এ বৃদ্ধ বয়সে নিয়মিত ভাল খাওয়ার জন্য পরামর্শ দিতাম, তিনি আমার পরামর্শ শুনেও নফসের খোরাক দিতে তিনি ছিলেন নারাজ। দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একান্তই নির্মোহ। আল্লাহ বলেন "প্রকৃত পক্ষে রাতের বেলা জেগে উঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রন করতে অনেক বেশী কার্যকর।" সূরা মুয্যাম্মিল-৭

www.pathagar.com

ইন্তেকাল

জনাব আবদুর রহমানের এ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অবসান ঘটে ২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ফজরের নামাজের পর পরই। তাঁর জানাযায় দাঁড়িয়ে অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন। হামদর্দের এমডি জনাব ইউসুফ হারুন মরহুমের ওয়াক্‌ফ করা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে উন্নত মানের করে গড়ার যে ঘোষণা প্রদান করেছেন তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। সদকায়ে জারিয়া হিসাবে তার এ অসমাপ্ত কাজ যেন শেষ করা যায় মহান আল্লাহর দরবারে কামনা করছি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমিন!

মরহুম সফি উল্লাহ ভূঁঞা

দায়ীর ভূমিকায় অসাধারণ

লক্ষ্মীপুরে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিকদের মধ্যে যারা ছিলেন, তাদের অন্যতম একজন হলেন জনাব সফি উল্লাহ ভূঁঞা। তিনি ছিলেন নিরহংকার, ছোট-বড় সকলের সাথে মিশতে পারতেন। তার অমায়িক ব্যবহার দিয়ে সকলকে আপন করে নিতেন। কিন্তু কোন ত্রুটি তিনি বরদাস্ত করতেন না। সরাসরি বলতে ও দিধা করতেন না। তাই সকলেই তাকে স্পষ্টভাষী বলে মনে করত।

পারিবারিক জীবন

সফি উল্লাহ ভূঁঞার পিতার নাম ছিল আলী উল্লাহ ভূঁঞা। দেশে ও চরে অনেক জমির মালিক ছিলেন। তার স্ত্রী ওহিদা বেগম ১৯৮৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তার চার ছেলে ও তিন মেয়ে। পরের সংসারে চার মেয়ে। বড় ছেলে মোহাম্মদ উল্লাহ দীর্ঘ দিন সৌদি আরবে ছিলেন। বর্তমানে দেশে একটি মসজিদে ইমামতি করছেন। মেঝো ছেলে আহমদ উল্লাহ ঢাকায় ব্যবসা করেন। তৃতীয় ছেলে হেদায়েত উল্লাহ ও ছোট ছেলে রহমত উল্লাহ ঢাকায় চাকুরী করেন। নেককার সন্তানের নেকের একটি অংশ পিতা-মাতার আমল নামায় যোগ হবে। তাই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি ছেলে মেয়েরা যেন দ্বীনের পথে সক্রিয় থেকে নাজাতের পথে চলতে পারেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

রাসূল (স) বলেন "ব্যবসায়ীরা হচ্ছেন আল্লাহর হাবীব"। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সফি উল্লাহ ভূঁঞা ব্যবসাকে নিজের পেশা হিসেবে বেচে নিয়েছেন। প্রথমে কাপড়ের ব্যবসা পরে মুদি দোকান সর্বশেষ লক্ষ্মীপুর শহরে কাপড়ের ব্যবসায়ী হিসেবে পেশাগত জীবন শেষ করেন। লক্ষ্মীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে চকবাজার ভূঁঞা বস্ত্রালয়ের মালিক ছিলেন তিনি। প্রথমে ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলেও শেষ জীবনে তা ধরে রাখতে পারেন নি। তিনি আলীপুর জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি ছিলেন।

রাজনৈতিক জীবন

জনাব মাষ্টার সফিক উল্লাহ সাহেব যখন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা আমীর, তখন অধ্যাপক গোলাম আযম লক্ষ্মীপুর সফর করেন। জনসভায় অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তৃতা শুনে সফি উল্লাহ ভূঁঞা সহ অনেকেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। রুকন হওয়ার পর সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। একপর্যায়ে তিনি লক্ষ্মীপুর সদর থানার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি তৎপরতার সাথে যোগাযোগের মিডিয়া হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কে কোথায় আছে, বগলে একটা ছাতি নিয়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিতেন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন তা আজকাল চিন্তাও করা যায়না। ১৯৮২ সালে ভূঁঞা বস্ত্রালয় যোগাযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমগ্র লক্ষ্মীপুর জেলার জামায়াতে ইসলামীর লোকজন এ দোকানে এসে সফি উল্লাহ ভূঁঞার সাথে দেখা করে সংগঠনের খোঁজখবর নিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হতো। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রায় সকল সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ মূলক প্রোগ্রাম ভবানীগঞ্জে অবস্থিত সফি উল্লাহ সাহেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। সংগঠনের প্রায় সকল প্রোগ্রাম গুলোতে খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সাথে পালন করতেন। কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ তাঁর বাড়িতে এসে প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করতেন। সফি উল্লাহ ভূঁঞা যতদিন কর্মক্ষম ছিলেন সাহসিকতার সাথে দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৩ সালে হজ্জ করেন। বড় ছেলে মোহাম্মদ উল্লাহ সৌদি আরবে থাকায় তার পক্ষে হজব্রত পালন করার সুযোগ হয়েছিল।

www.pathagar.com

শেষ জীবন

সফি উল্লাহ ভূঁঞা শেষ জীবনে আর্থিক অভাব অনটনে জীবন অতিবাহিত করেছেন। বার্ধক্য জনিত রোগে শোকে কষ্ট পেয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহের অধিকারী। শীতকালে তিনি মোটেই শীত অনুভব করতেন না। প্রায় ৭০ বছর বয়সে ০৯/১২/২০০৯ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাহি রাজেউন। আল্লাহ তাঁর সকল নেক আমলকে কবুল করে জান্নাতবাসী করুন। আমিন!

মরহুম আবুল বাসার মিয়া

আমানতদার ও সততার এক জীবন্ত মডেল

লক্ষ্মীপুর জেলার সমসেরাবাদ নিবাসী আবুল বাসার মিয়া জামায়াতে ইসলামীর অগ্রপথিকদের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তি ছিলেন। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল লক্ষ্মীপুরের ইসলামী আন্দোলন। আজীবন জৌলুসহীন জীবন যাপন করে পরপারে পাড়ী দিয়েছেন। রেখে গেছেন ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনেক উদাহরণ। ব্যবসার ফাকে ফাকে দায়ী ইলাল্লাহর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহারের কারণে সকলকে আপন করে নিতেন। বিপদে মুছিবতে সঠিক পরামর্শ দিতেন বুদ্ধিমত্তার সাথে। তাঁর নেতৃত্বে আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে সকলের মন বিগলিত হয়ে যেত। যে কারণে সকলেই তাঁর সাথে মুনাজাতে অংশ গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষা

১৯৪৫ সালে আবুল বাসার মিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ রোকন আলী ব্যাপারী। তিনি ছিলেন একজন নামকরা ব্যবসায়ী। আবুল বাসার মিয়া যখন দশম শ্রেনির ছাত্র তখন তার পিতা রোকন আলী ইন্তেকাল করেন। আবুল বাসার মিয়ার ছিল ছোট এক ভাই ও এক বোন। এই অল্প বয়সে পিতা হারিয়ে আবুল বাসার মিয়াকে পিতার ব্যবসা ও সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। যে কারণে শিক্ষা জীবনের গতি থেমে গেল। স্বল্প শিক্ষিত হওয়ার পরও সকল স্তরের মানুষের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম ছিলেন তিনি। আলাপচারিতা ও কাজেকর্মে বুঝা যেত না তিনি উচ্চ শিক্ষিত নয়।

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন

জনাব আবুল বাসার মিয়া লক্ষ্মীপুরের নামকরা মজিদ মাষ্টার বাড়িতে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী ছিল মজিদ মাষ্টারের নাতনি, আবদুল মতিন সাহেবের কন্যা জাকেরা বেগম। জাকেরা বেগম ছিল অত্যন্ত ধার্মিক ও দানশীল। ২৯/০৮/১৯৯৯ সালে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে মহিলারা যেভাবে এসেছিল ও কান্নাকাটি করেছিল, এতে বুঝা যায় গরীব দুঃখী মহিলা সহ সকলের স্তরের মহিলাদের তিনি কতটুকু হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি এক ছেলে ও চার মেয়ের জননী। বড় মেয়ে মরিয়ম বেগম বকুল জামায়াত ইসলামীর রুকন। একমাত্র ছেলে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নাদিম বাংলাদেশ মেডিকেল হলের মালিক। সে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রসর কর্মী। আমরা সকলেই মহান আল্লাহর কাছে আকুতি নাদিমসহ মেয়েরাও যেন তার পিতার ঐতিহ্য ধরে রেখে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

কর্মজীবন

আবুল বাশার মিয়া পিতার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া ব্যবসার কাজ শুরু করেন। সুপারী ও মরিচ কিনে বিভিন্ন জেলায় চালান দিতেন। যে কারণে বিভিন্ন জেলায় ব্যবসার কাজে যাতায়াত করতে হতো। অপর দিকে ঔষধের ব্যবসা ছিল। দোকানের নাম হয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল হল। ব্যবসা ও সংসার পরিচালনায় যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সফলতা অর্জন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৬৬ সালে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেয়েছেন। জামায়াতে যোগদানের দুই বছরের ব্যবধানে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর চট্টগ্রাম গিয়ে আবার সদস্য (রুকন) শপথ নেন। হাতে গোনা কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সংগঠনের সম্প্রসারণ ঘটে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জেলা মজলিশে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন বায়তুলমাল সেক্রেটারী হিসেবে আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বায়তুলমালের টাকা আলাদা আলাদা প্যাকেটে সংরক্ষণ করতেন। টাকার প্রয়োজন হলে বিভিন্ন প্যাকেট থেকে টাকা প্রদান করে হিসাব লিখে রাখতেন। এ ধরণের আমানদারীর নজির পাওয়া খুবই বিরল। দেশী-বিদেশী

www.pathagar.com

প্রবাসীদের অনেক আমানত তিনি সংরক্ষন করতেন। তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। কিভাবে হজ্জের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় এ বর্ণনা শুনে অনেক হজ্জযাত্রী খুবই উপকৃত হত।

সমাজ সেবা

সমাজ সেবক হিসেবে তিনি লক্ষ্মীপুরে ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মরহুম মাষ্টার সফিক উল্লাহ সাহেবের বাড়ির সামনে লক্ষ্মীপুর দারুল আমান ট্রাস্ট ও ইয়াতিমখানার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন এই ইয়াতিমখানার ডোনার ও ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। দারুল আমান ট্রাস্টের ও আজীবন সদস্য ছিলেন। লক্ষ্মীপুরের প্রখ্যাত সোনামিয়া ইদগাহ জামে মসজিদের তিনি ছিলেন সম্মানিত সদস্য। অপর দিকে গ্রাম শালিশদার হিসেবে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গরীব দুঃখী মানুষের পুনর্বাসনের কাজ ও তিনি করে গেছেন।

ইন্তেকাল

জনাব আবুল বাসার মিয়া ২০০৩ সালের ২৭ অক্টোবর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর মৃত্যু হয় প্রায় চার বছর পূর্বে। চার কন্যা ও একমাত্র ছেলেকে রেখে যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। রেখে যান একমাত্র ছোট ভাই মোঃ আবুল খায়ের মিয়াকে। তিনি বর্তমানে কেমিষ্ট এন্ড ড্রানিষ্ট লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি এবং শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি। সন্তান ও ভাই যেন ইসলামী আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারে, আল্লাহর দরবারে সেই তৌফিক কামনা করছি।

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল জাব্বার

সদালাপী, নিরহংকার, সাদা দিলের মানুষ

নিরহংকার, জনদরদী, খোলামনের এক মহান ব্যক্তি হযরত মাওলানা আবদুল জাব্বার। যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসতেন অতি সহজেই তিনি তাকে আপন করে নিতেন। দলমত নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ন্যায়ের পক্ষে ছোট-বড় সকলের জন্য তিনি সমান ভাবে আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করতেন। তাঁর সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা সকলকে আকৃষ্ট করতো। সত্যের সাক্ষ্য দাতা বলে মনে হতো।

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল জাব্বার ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে জন্ম গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীপুর জেলাধীন রায়পুর উপজেলার হায়দরগঞ্জের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন ধার্মিক লোক হিসাবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি এতদূর অগ্রসর ছিলেন যে, জনগন তাঁকে সুফী সাহেব হিসাবেই চিনতেন।

মাওলানা আবদুল জাব্বার হায়দরগঞ্জ মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৬০ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে আলিম প্রথম বিভাগে এবং ১৯৬৬ সালে ফাযিল প্রথম শ্রেণি লাভ করেন একই মাদ্রাসা থেকে। মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে ১৯৬৮ সালে বেশ ভাল নম্বর পেয়ে ১ম শ্রেনিতে কামিল পাশ করেন। লক্ষ্মীপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে কেবল মাত্র মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব ২য় বিভাগে বি.এ পাশ করে একক সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭৬ সালে চট্রগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ২য় শ্রেনিতে ১ম স্থান অধিকার করে এম,এ পাশ করেন। প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

বৈবাহিক জীবন

মাওঃ আবদুল জাব্বার রায়পুর উপজেলার ৭নং বামনী ইউনিয়নের আখন্দ বাড়ির সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারীতে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী নাম আসমতের নেছা। তিনি এখনও আল্লাহর মেহেরবাণীতে বেঁচে আছেন। ৩ ছেলে ৩ মেয়ে রেখে গেছেন। বড় ছেলে নাজমুস শাহাদাত শাহিন মরহুমের

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক। মেঝো ছেলে নাজমুল হুদা সোহেল ইসলামিক ল রিসার্স এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ লিমিটেড এর এক্সিকিউটিভ অফিসার। ছোট ছেলে কামরুল হাসান তুহিন তামিরুল মিল্লাত মাদ্‌রাসার দশম শ্রেণির ছাত্র।

কর্মজীবন

১৯৬৮ সালে মাওলানা আবদুল জাব্বার হায়দরগঞ্জ তাহেরিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসায় সহঃ সুপার হিসাবে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। এরপর ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে বি.এম.সি কলেজ চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার বাঁধের হাট এ. এস কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮০ সালে ১ সেপ্টেম্বর থেকে হায়দরগঞ্জ ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় মাদ্‌রাসার শিক্ষার মান ও অবকাঠামোর দিক থেকে উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিনত নেয়। রায়পুর উপজেলায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিট হিসাবে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়। দুই যুগ অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৬৯-৭০ সেশনে ফেনী টিসার্স ট্রেনিং কলেজ ডানপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্যানেল থেকে তিনি ভি.পি প্রার্থী হন এবং বিপুল ভোটে ভি.পি নির্বাচিত হন। এম.এ শেষ বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে ইসলামী ছাত্র সংঘের বিকল্প নাম "ইসলামী ছাত্র মিশনের" সাথী শপথ নেন। শপথ গ্রহণ করাণ তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের। কর্ম জীবনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকে ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সু-সম্পর্ক রেখে চরিত্রের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াতের শপথ করেন।

মাওলানা আব্দুল জাব্বার ১৯৯১ সালে লক্ষ্মীপুর-২ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর জাতীয় সংসদের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। ১৯৯৬ সালে ও তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে না পারলেও জনগনের কাছে সুপরিচিত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবত ১৯৯৬ সাল থেকে মাওলানা আবদুল জাব্বার জেলা জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীর মজলিসে শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন। ০৯/১১/২০০১ তারিখে মাওলানা আবদুল জাব্বার জামায়াতে ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলার আমীর নির্বাচিত হয়। একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হিসেবে তিনি আমীর নির্বাচিত হওয়ায় সকলের কাছে গ্রহন যোগ্যতা লাভ করে এবং লক্ষ্মীপুর সংগঠনে পূর্বে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরভিত হয়ে যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ জনক হচ্ছে ২০০৩ সালে ৩১ জানুয়ারী তিনি ব্রেইন ষ্টোক করে ভোকাল প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। এ জন্য তাকে জেলা আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তখন বর্তমান জেলা আমির জনাব রুহুল আমিন ভূঁঞাকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সামাজিক কাজ

ছাত্র জীবন থেকেই মাওলানা আবদুল জাব্বার সক্রিয়ভাবে সামাজিক কাজে জড়িত ছিলেন। একজন ভাল প্রশাসক, ভাল শিক্ষক, উত্তম সামাজ সেবক ও সংস্কারক হিসাবে সকলের কাছে গ্রহন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সরকারী ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে অগনিত বিচারের তদন্ত কার্য সম্পাদন করে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। গ্রাম শালিশে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাই জনগনের কল্যানে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। গ্রহনযোগ্য আমানতদার ও দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা প্রদান করতেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে।

সাহিত্যকর্ম

মাওলানা আবদুল জাব্বার ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালীন সময়ে "ইসলাম রবি" নামক একটি সীরাত গ্রন্থের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফেনী টিসার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়ন কালীন সময়ে প্রকাশিত ম্যাগাজিনে মরহুমের দুটি লেখা প্রবন্ধ "ইসলামের স্বরূপ" ও "ভ্রমন কাহিনী" প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ আত্মজীবন নামে একটি পান্ডুলিপি রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

ইন্তেকাল

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ইসলামী আন্দোলনের এই নিবেদিত প্রাণ অগ্রপথিক ২০০৭ সালের ২৯ জুন ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ আমাদের এ শ্রদ্ধেয় নেতা মরহুম মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমিন!

www.pathagar.com

মরহুম মাষ্টার সিরাজুল হক

আল্লাহর দ্বীনের পথে নিবেদিত প্রাণ

মাষ্টার সিরাজুল হক ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের এক সাহসী সৈনিক। তার পিতার নাম শওকত আলী দেওয়ান। তিনি ১৯৫১ সালের ১৮ জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। এস.এস.সি ও সি.ইন.এড পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে ২৯ আগষ্ট থেকে চর আবাবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তিতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাষ্টার সিরাজুল হক ১৯৮০ সালের দিকে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সদস্য হন। ১৯৮৭ সালে জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়তের শপথ গ্রহণ করেন। জামায়াতে যোগদানের কিছুদিন পরেই তিনি রায়পুর থানাধীন ২নং চরবংশী ইউনিয়নের সভাপতি মনোনিত হন। এরপর তিনি রায়পুর পশ্চিম সাংগঠনিক থানার আমীর নির্বাচিত হন। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় রায়পুর পশ্চিম সাংগঠনিক থানার কার্যক্রম রায়পুর পূর্ব সাংগঠনিক থানার কার্যক্রম থেকে অগ্রসর হয়ে যায়। ১৯৮৮ সালে তিনি রায়পুর থানা সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৯২-৯৩ সালে রায়পুর থানা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে লক্ষ্মীপুর -২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের নমিনি ছিলেন। এ সময় মাষ্টার সিরাজুল হক নির্বাচন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকায় ছিল নিবেদিত প্রাণ। তার হাতের লেখা ছিল আকর্ষনীয়। সাংগঠনিক রিপোর্ট তৈরী ও পেশ করার ক্ষেত্রে তিনি সকল সময়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হতেন। রিপোর্ট পর্যালোচানার ক্ষেত্রে ও সঠিক পরামর্শ দিতেন সুন্দরভাবে।

www.pathagar.com

সমাজ সেবা

সমাজ কর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন এলাকার একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি হায়দরগঞ্জ চাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। তার সময়ে হায়দরগঞ্জ চাষী কল্যাণ সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ইরি চাষে সাফল্য অর্জন করেছিল। লক্ষ্মীপুর জেলার মধ্যে হায়দরগঞ্জ চাষী কল্যান সমিতি উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তিনি সমাজ সেবা মূলক কাজের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি জনগনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। গ্রামের শালিশ মীমাংশাকারী হিসাবে ও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারনে মানুষ তাকে খুবই বিশ্বাস করতো। যার ফলে তিনি কঠিন ও জটিল সমস্যা ও সমাধান করতে সক্ষম হতেন।

ইন্তেকাল

মাষ্টার সিরাজুল হক ১৯৯৯ সালের ১৯ জুন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার স্ত্রী, পাঁচ ছেলে, দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানাযায় হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দোয়া করেন। রায়পুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মরহুমের জীবনের উপর আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠান হয়। তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ মর্যাদা, মাগফেরাত ও রহমত কামনা করছি। আমিন!

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শহীদ ডাক্তার ফয়েজ আহমদ

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানীর প্রত্যয় ছিল যার

বর্তমানে বাংলাদেশ এখন একটি অবরুদ্ধ জনপদের নাম। বাম ও রামপন্থী আওয়ামী সরকার নির্লজ্জভাবে অনৈতিকতার উচ্চ শিখরে আরোহন করে সীমাহীন দূর্নীতি, হত্যা, গুম, নির্যাতন, গ্রেফতার, হয়রানি, অন্তর্ঘাত ও চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। এ সরকারের নিকট দেশ, দেশের মানুষ, অর্থনীতি, গণতন্ত্র, সংবিধান মানবাধিকার কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরদিকে বৃহত্তম জনগনের প্রাণের ধর্ম ইসলামের উপর অবিরাম আঘাত হানছে। বর্তমানে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন। দানবের নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস। আমাদের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে কোলখালি হওয়া মায়ের আহাজারি, সন্তানহারা পিতার দীর্ঘশ্বাস, ইয়াতিম হওয়া সন্তানের কান্নাররোল আর ইসলামের পথে প্রাণ উৎসর্গ করার বজ্র শপথ। এরই প্রেক্ষাপটে কিছুটা হলেও শান্ত জনপদ লক্ষ্মীপুরে ঘটে গেল নির্লজ্জ পৈশাচিক হত্যাকান্ড। আর এর শিকার হলেন লক্ষ্মীপুরের জনপ্রিয় চিকিৎসক, সমাজ সেবক, ইসলামী আন্দোলনের অকুতভয় সৈনিক গণমানুষের সংগঠন জামায়াতে ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলা নায়েবে আমীর ডাক্তার ফয়েজ আহমদ। আল্লাহর বানী হচ্ছে, "তোমাদের উপর এ সময়টা এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কারা এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদেরকে বাছাই করে নিতে চেয়েছিলেন, যারা আসলেই শহীদ বা (সত্যের) সাক্ষী। কেননা জালিমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না"। সূরা আলে ইমরান- ১৪০

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

ডাঃ ফয়েজ আহমদ লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জে ১৯৪৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার গ্রামের বাড়ি ছিল লামচর ইউনিয়নের রসুলপুর। পিতার নাম হচ্ছে জয়নাল আবদীন, মাতা আমেনা বেগম। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ ছিলেন সবার ছোট। বড় ভাই জনাব মকবুল আহমদ বাসাবাড়ি করে

www.pathagar.com

ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বড় ভাই ও এক বোন আল্লাহর রহমতে বেঁচে আছেন। শহীদের দুই ছেলে, দুই মেয়ে।

তার বড় ছেলে ডাঃ হাসান উল বান্না (৩৩) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাশ করে পরবর্তিতে এফ.আর.সি.এস পাশ করেন। বর্তমানে তিনি সার্জারিতে এফ.সি.পি.এস শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় আছেন। পাশাপাশি তিনি ধানমন্ডিস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ ইসালামী ছাত্র শিবিরের সদস্য ছিলেন। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ জোনের সভাপতি ও কুমিল্লা রেটিনার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। ডাঃ হাসান উল বান্নার স্ত্রী একজন এম.বি.বি.এস ডাক্তার এক কন্যার জননী। ডাঃ হাসান উল বান্নার শশুর জনাব শহীদুল ইসলাম একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। তিনি ইসলামী ব্যাংক এর সাবেক ডিরেক্টর ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান। তিনি আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর সন্তান মরহুম রফীক বিন সাঈদীর বেয়াই। শহীদের ছোট পুত্র বেলাল আহমদ (৩২) আই.আই.ইউ.সি. ঢাকা ক্যাম্পাস হতে বি.এস.সি.ইন.সি.এস.ই সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথী ছিলেন এবং ঢাকা মহানগরী পশ্চিম ইংলিশ মিডিয়াম শাখার সহকারী পরিচালক ছিলেন। তিনি বর্তমানে তার পিতার ইচ্ছা ক্রমে লক্ষ্মীপুরে অবস্থান করছেন। বেলাল আহমদ একটি টেকনিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা ও ব্যবসা করছেন। তার স্ত্রী এখনও অধ্যয়নরত। শশুর জনাব মাওঃ নাজমুল হুদা রায়পুর উপজেলার ৬নং কেরোয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সমাজ সেবক ও শিক্ষক।

শহীদের বড় মেয়ে সালেহা কাউসার (২৯) আই,আই,ইউসি চট্টগ্রাম সিটি ক্যাম্পাস হতে ইংলিশে অনার্স ও মাষ্টার্স সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে এক কন্যার জননী ও স্বামী কম্পিউটার প্রকৌশলী মুকিতুর রহমান আদনানের সাথে তার শশুরালয় ঢাকায় অবস্থান করছেন। শহীদের ছোট মেয়ে উজমা কাউসার (২৬) মানারাত ইউনিভার্সিটি হতে ফার্মাসিতে অনার্স এবং পরবর্তিতে ষ্টেট ইউনিভাসিটি হতে ফার্মাসিতে মাষ্টার্স পাশ করেছেন। বর্তমানে সে গৃহিনী এবং শশুরালয়ে অবস্থান করছেন। স্বামী সাইফুল ইসলাম একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদের মাতার মৃত্যুর পর তাঁর বড় ভাই জনাব মকবুল আহমদ এবং বড় বোনের প্রচেষ্টায় তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি বড় বোনের বাড়ি থেকে ফরিদগঞ্জের গৃদকালিন্দিয়া স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তিতে বড় ভাই তাঁকে ষাটের দশকে ঢাকায় নিয়ে যান। পুরান ঢাকার ওয়েষ্টিন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও তৎকালিন জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর তিনি নারায়নগঞ্জের তোলারাম কলেজ হতে ডিগ্রী পাশ করেন। পরবর্তিতে তিনি পাকিস্তান যাওয়ার সুযোগ পেয়ে লাহোর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি এম.বি.বি.এস পাশ করেন। এরপর তিনি সনোলজিষ্ট কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি ট্রেইন্ড বি.এস.ইউ ঢাকা।

বৈবাহিক জীবন

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ এম.বি.বি.এস পাশ করার পর ১৯৮০ সালে মার্জিয়া বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মার্জিয়া বেগম তখন ইডেন মহিলা কলেজ হতে কেমিষ্ট্রিতে (রসায়ন বিজ্ঞান) অনার্স সম্পন্ন করার পর মাষ্টার্সে অধ্যয়নরত ছিলেন। শহীদের শশুরালয় শেরপুর জেলার নকলা থানার গনপদ্দি। মার্জিয়া বেগমের পিতা নকলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মার্জিয়া বেগম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ৮ জনের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য এবং মহিলা সংগঠনের কুমিল্লা অঞ্চলের দায়িত্বশীলা। তিনি লক্ষীপুর জেলায় জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগ, ছাত্রী সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রপথিক। তিনি এক অসাধরণ ধৈর্যশীল মহিলা। শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ যে অগনিত মানুষের মেহেমানদারী করেছেন, তার পিছনে মূখ্য ভূমিকা ছিল মার্জিয়া বেগমের । এটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে স্বামীর শাহাদাতের পর। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে রয়েছেন, যারা সবর করে"। সূরা বাকারা - ১৫৩

কর্মজীবন

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ লাহোর জেনারেল হাসপাতালে আর.এম.ও এবং চুং লাহোরের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেশে চলে আসেন। তিনি ১৯৮৮ সালে লক্ষীপুরে কাউসার ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে রোগীদের চিকিৎসা সেবা শুরু করেন। তখন বহু দূর-দূরান্ত ভোলা, বরিশাল,

www.pathagar.com

চাঁদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালী হতে তার কাছে রুগী আসত। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কল পেয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কারণে তাঁর পরিচিতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৩ সালে তিনি কয়েকজন ডাক্তার ও এলাকাবাসীকে নিয়ে লক্ষ্মীপুরে প্রথম একটি প্রাইভেট কোম্পানি গঠন করে, লক্ষ্মীপুর আধুনিক হাসপাতাল লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এম.ডি) ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই হাসপাতালকে চিকিৎসা সেবার মান উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন। এ ছাড়াও তিনি বায়োফার্মা গ্রুপ, নিরাপদ ফুডস, নিরাপদ আবাসন লিঃ সহ আরও বিভিন্ন বেসরকারী/প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর সাথে জড়িত ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য ছিলেন। তিনি যখন লাহোর মেডিকেল কলেজে পড়ালেখা করেন তখনও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ছাত্র জীবন শেষ করার পরই জামায়তে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি লহোর থেকে দেশে ফিরে আসার পরও জামায়াতে ইসলামীর সাথে সু-সম্পর্ক রাখেন। আন্দোলনের কাজে তিনি সক্রিয় হন ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৪ সালে শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ জামায়াতের রুকন হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে তিনি লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের মজলিসে শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। জামায়াতে ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন ২০০২ সালে। ৮ বছর যোগ্যতার সাথে জেলা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে তিনি জেলা নায়েবে আমীর নিযুক্ত হন। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নায়েবে আমীর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। অপরদিকে জামায়াতের শ্রম ও চিকিৎসা বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। তাই ছাত্র নেতৃবৃন্দ অভিভাবক হিসাবে তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর তুলনা নেই। মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। যে কারণে মাদ্‌রাসা শিক্ষিত না হলেও আলোচনায় অগণিত কুরআন হাদীসের রেফারেন্স দিতে সক্ষম ছিলেন। একজন আলেমের মত দারসুল কুরআন পেশ করতেন। এক-দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দিলে ও

www.pathagar.com

যেন তার বক্তব্য শেষ হতো না। আল্লাহ তাঁর কুরবানীকে কবুল করুন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মরহুম সফিক উল্লাহ সাহেব বলতেন, "আমি ডাঃ ফয়েজের মত একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্মীপুরে এনেছি।" যে প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আন্দোলনের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন।

সামাজিক কাজ

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদের চিকিৎসা ও সমাজ সেবার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লিখে শেষ করা অসম্ভব। সমাজ সেবক হিসাবে লক্ষ্মীপুর জেলায় তিনি ছিলেন গণমানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি বিভিন্ন স্কুল, মাদ্‌রাসা, মসজিদ, ফোরকানিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিউম্যান ডেভোলপমেন্ট ট্রাষ্ট করে লক্ষ্মীপুর পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, হলিহার্ট ফাউন্ডেশনের অধিনে হলিহার্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর গ্রামের মানুষের চিকিৎসার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন। আল ইসলাম সোসাইটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে শত শত গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। নিজস্ব চেম্বারে দল ও মতের উর্ধ্বে থেকে অভাবী ও শ্রমিক শ্রেনীর অগণিত মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। সল্প আয়ের মানুষের অত্যন্ত কম খরচে চিকিৎসা করতেন।

ইসলাম বিরোধীদের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চিকিৎসার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে যেতেন। ব্যাগ ভরে ঔষধ নিয়ে সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। অনেক পরিবার এমন রয়েছে যাদের থেকে ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন ও ঔষধের মোটেই কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না।

আর্থিক সাহায্য ও গরীব দুঃখি মানুষকে কি পরিমাণ সাহায্য করেছেন তা জানা সম্ভব নয়। কারণ দানের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তিনি দুঃস্থ মানুষের ঘর করে দিতেন। কারো অভাবের কথা জানলে চাউলের বস্তা পাঠিয়ে দিতেন, সদাই করে নিয়ে যেতেন। শ্রমিক শ্রেণি বিশেষ করে রিক্সা শ্রমিকদের পুনর্বাসন করা রিক্সা কিনে দেয়া, আনুষ্ঠানিক ভাবে খাওয়ানো ও আর্থিক সহযোগিততা করা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। লক্ষ্মীপুর জেলার বাহিরে ও দূর্দশাগ্রস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় জামায়াতের ফান্ডে অর্থ প্রেরণ করতেন। সব সময়ই তিনি

www.pathagar.com

হক্কুল এবাদতের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করতেন। বাস্তবে ও বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে সদা তৎপর ছিলেন। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও আত্মীয় সজনের হক আদায়ে শতভাগ পূরনের জন্য চেষ্টা করেতেন। বিভিন্নভাবে এর প্রমাণ মেলে। কি পরিমান মেহেমানদারী তিনি করেছেন, বিশেষ করে সংগঠনের লোকজন, আত্মীয় স্বজন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিবর্গ, পাড়া-প্রতিবেশী ও আলেম ওলামা যার নজির বিরল। সহজে নিজে কোথাও খেতে চাইতেন না। খাওয়াতে পারলেই যেন তৃপ্তি বোধ করতেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলনের জন্য আর্থিক কুরবানীর উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। মালের কুরবানীর ওয়াদা করে দ্রুত পরিশোধ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন। ওয়াদা পূরণ করে স্বস্তি বোধ করতেন। জামায়াত ও শিবিরের মধ্যে সাংগঠনিক অথবা পারস্পরিক কোন সমস্যা দেখতে পেলে তিনি তা দূরকরার জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন। সমাধান করতে পারলে সকলকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে শুকরিয়া আদায় করতেন।

হজ্জব্রত পালন

২০০০ সালে শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ, তাঁর স্ত্রী মার্জিয়া বেগম, বড় ভাই জনাব মকবুল আহমদ, দুই বোন ও আমাকে (লেখক) নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। পরে আবার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওমরা পালন করেন।

শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা

বিরোধী দলের আন্দোলকে যখন বাংলাদেশ সরকার ফেসিবাদী কায়দায় তা দমন করছে। এরই প্রেক্ষাপটে ১৩/১২/১৩ তারিখ শুক্রবার র‍্যাব ও অজানা বাহিনীর গুলিতে নিহত তিনজনের লাশকে সামনে রেখে সোনামিয়া ঈদগাহ ময়দানে শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ সহ হাজারো মানুষ জানাযার নামাজ আদায় করেন। বেদনাদায়ক হচ্ছে পরদিনই তার জানাযা আমাদেরকে পড়তে হয়। সেই দিন দিবাগত রাতেই র‍্যাব ও মুখোশধারীদের বর্বরচিত নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপ্রিয় নেতা ডাঃ ফয়েজ আহমদ। কি ধরণের পৈশাচিক কায়দায় তাঁকে হত্যা করে, কলমের ভাষায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। রাত ১১ টার পর কিলারেরা একটার পর একটা দরজা ভাংছে, তখন তিনি অজু করে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করলেন। স্ত্রীকে বলেন,"তুমি চিন্তা করো না, এরা আমাকে গ্রেফতার করবে।" তাই তিনি জেলখানায় যাওয়ার জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় ও ঔষধ ব্যাগে নিলেন। পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে যে গেইট অস্ত্রধারীরা ভাংতে পারছিলনা ডাঃ ফয়েজ আহমদ "আস্সালা মুআলাইকুম" বলে সেই গেইটের তালা খুলে দিলেন। আর যায় কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরাপরাধ বান্দাটির উপর। টেনে হিঁচড়ে তিন তলার ছাদের উপর নিয়ে গেল। বন্দুকের বাঁট ও নল, লোহার রড় দিয়ে প্রায় ২ ঘন্টা পর্যন্ত সকল জয়েন্ট ও হাড়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। মূমূর্ষ অবস্থায় ৩য় তলার ছাদ থেকে বিল্ডিং এর সামনে পাকা জায়াগায় ফেলে দিয়ে মাথা ও পায়ে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। যখন তারা হায়নার মত ডাঃ ফয়েজ আহমদের উপর অত্যাচার করছিল তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জান? তোমরা আমাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছ।" এরপর উক্ত বাহিনী ডাঃ ফয়েজ আহমদের লাশ সদর হাসপাতালের সামনে ফেলে যায়।

ডাঃ ফয়েজ আহমদের বাসায় আক্রমন হতে পারে, এজন্য তাঁরও আশংকা ছিল, অন্যরাও বলেছিল। কিন্তু এরপরও তিনি বাসা থেকে সরতে রাজি হলেন না। তিনি বলেছিলেন "মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সময় নির্ধারিত থাকে, সেটা যেখানেই থাকে সে মৃত্যু অবধারিত। তাই মৃত্যু ভয়ে আমি পালাব না।" কি অপরাধ ছিল ডাঃ ফয়েজ আহমদের? যিনি শত সহস্র বঞ্চিত মানুষের উপকার করেছেন। কাউকে ধোকা দিতেন না, কারো প্রতি যুলুম করেনি। এটাই কি তাঁর অপরাধ? তিনি বাংলার জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক ছিলেন। লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করা হলো। রাব্বুল আলমীন তুমি এর কুরবানীকে কবুল করে তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করো।

শহীদের জানাযা

ডাঃ ফয়েজ আহমদকে সরকার নির্লজ্জ প্রক্রিয়ায় নির্মম ভাবে হত্যা করায় লক্ষ্মীপুর সহ দেশের মানুষ হতবাক হয়ে যায়। গোটা লক্ষ্মীপুর জেলায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষ করে পর পর দুই দিনে ছয় জনের নারকীয় হত্যাকান্ডে লক্ষ্মীপুর শহরের মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্থ । শহীদের বাসার দিকে পুলিশ, র‍্যাবের নজরদারী। শহীদের লাশ হাসপাতাল থেকে বাসায় আনা হয়। বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত চারদিক থেকে আপন জনেরা ছুটে আসতে লাগল।

www.pathagar.com

জনপ্রিয় ডাক্তার, সমাজ সেবক, অভিভাবক, প্রাণপ্রিয় নেতার কফিন দেখে সেখানে এক হৃদয় বিদারক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করল, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অপরদিকে ১৮ দলের অবরোধ চলছে। এই অবস্থায় ১৪/১২/১৩ তারিখ শনিবার বেলা ২টায় জানাযার সময় নির্ধারণ করা হয়। ভয় ভিতিকে উপেক্ষা করে লক্ষ্মীপুর লিল্লাহ জামে মসজিদ ময়দানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের সকল বাধাকে উপেক্ষা করে প্রায় দশ হাজার লোক জানাযায় অংশ গ্রহণ করে। যখন বড় ছেলে ডাঃ হাসানউল বান্না ও ছোট ছেলে বেলাল আহমদ বক্তব্য রাখছিল তখন চারদিক থেকে কান্নার রোল পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই অবস্থায় জানাযার নামাজ শেষ করে লিল্লাহ জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "জান্নাতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না। যদি ও তার জন্য দুনিয়ার সব কিছু নিয়ামত হিসাবে থাকবে। কিন্তু শহীদ সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদি মৃত্যু বরণের আকাংক্ষা করবে, কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে।" বুখারী

শহীদ মোঃ নূর উদ্দিন

ছোটদের প্রেরণার প্রতীক

শহীদের পরিচয়

শহীদ নূর উদ্দিনের গর্বিত পিতার নাম মোঃ সেকান্দর মিয়া। সার্থক মাতা শহীদা বেগম। ঐতিহ্যবাহী বশিকপুর আলিয়া মাদরাসার নবম শ্রেণির ছাত্র। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে থাকতেই দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদান করে। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বই অধ্যয়ন করে ইসলামকে বুঝতে পেরেছে। সংগঠনের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আন্দোলনের কাজের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। গরীব পরিবার হিসাবে সংসারের অনেক কাজ তাকে করতে হত। পড়ালেখা, সংগঠনের কাজ,

www.pathagar.com

মক্তবে ছোটদের পড়ানো আবার পিতার কৃষি কাজে সাহায্য করাসহ সবগুলোকে সমন্বয় করে সুন্দর ও পরিপাটি করে চলতো।

শহীদ হওয়ার দিন

ছোট ভাইকে মক্তবে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের ডাকে লক্ষ্মীপুর মিছিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে নূর উদ্দিন বাড়িতে গেল। বাড়িতে গিয়েই মাকে লক্ষ্মীপুর যাওয়ার কথা জানাল। মা বলল নাস্তা খেয়ে নাও। নূর উদ্দিন বলল সময় নেই পথে খেয়ে নেব। মা বলল এগুলো আমাদের কি দরকার ? নুর উদ্দিন বলল "এগুলো নাযাতের জন্য"। এই পথে মারা গেলে ও শাহাদাতের মত মর্যাদা লাভ করে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম পুরস্কার পাওয়া যাবে। বাবা এসে বলল,নূর উদ্দিন এর পিছনে সময় ব্যয় করে কি লাভ হবে? জবাবে নূর উদ্দিন বলল, "তাহলে আমাকে দু'টো গরু কিনে দাও। আমি হাল চাষ করব।" একথা শুনে পিতা নূর উদ্দিনকে লক্ষ্মীপুর যাওয়ার অনুমতি দিল। তখন সে তাড়াতাড়ি করে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

কিভাবে শহীদ হলো

১৯৯১ সাল সারা দেশে স্বৈরাচারী শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিভিন্ন ধরনের কুটকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ চলছে তীব্র গতিতে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের নমিনী হলো মাষ্টার সফিক উল্লাহ। শহীদ নূর উদ্দিন ও সাইকেল চালিয়ে মিছিলে অংশ গ্রহনের জন্য মোল্লার হাট থেকে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামান্য দূরে ট্রাফিক চত্বরে আসলে একটি দ্রুতগামী ট্রাক এসে নূর উদ্দিনকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই নূর উদ্দিন শত, সহস্র ভক্তকে শোকের সাগরে নিমজ্জিত করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করল। শহীদের কফিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। অপরদিকে লক্ষ্মীপুর সোনামিয়া ঈদগাহ ময়দান থেকে শুরু হয়ে পিয়ারাপুর, ভবানীগঞ্জ, দাসের হাট, চরশাহী, চন্দ্রগঞ্জ, বটতলী, দত্তপাড়া, বশিকপুর, জকসীন হয়ে আবার সোনামিয়া ঈদগাহ ময়দানে এসে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। মিছিল শেষ করে শহীদের সঙ্গি ও সাথীরা জানাযায় অংশ গ্রহনের জন্য শহীদ নূর উদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। এ সময় শহীদের কপিনকে সামনে রেখে পিতা, মাতা, ভাই-বোন এবং সাথী, বন্ধু, শুভাকাংঙ্খীদের

www.pathagar.com

মধ্যে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন সকলেই। জানাযা শেষে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় সকলেই বিদায় নেন।

শহীদের মর্যাদা

শহীদ নূর উদ্দিন শাহাদাতের তীব্র বাসনা মাকে জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে রোগাক্রান্ত কিংবা দূর্ঘটনায় মারা যায় তাহলে ও তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।" এর মাধ্যমে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই নূর উদ্দিনকে শহীদ হিসাবে কবুল করেছেন। লক্ষ্মীপুরের ছোট বালকটি যেভাবে আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আল কুরআনে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন "তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও, তবে আল্লাহর রহমত ও দান তোমাদের নসিব হবে। এই সব লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করেছেন, তা থেকে অনেক উত্তম।" সূরা আলে ইমরাণ-১৫৭

শহীদ ফজলে এলাহী

শহীদী চেতনায় যার মন ছিল ভরপুর

শহীদ আরবী শব্দ। এর মূল ধাতু শাহাদ থেকে শাহাদাত। যার অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য। সাক্ষ্য সেই দেয় যে নিজে স্বচোক্ষে দেখেছে। কুরআন মাজীদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে, অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবান করার অর্থে। যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে প্রকৃত পক্ষে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য ছিল যে, সে মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহন করে নিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে "ওয়াকাফা বিল্লাহে শাহীদা" অর্থ্যাৎ যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। এই সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে একজন হচ্ছে শহীদ ফজলে এলাহী।

শহীদের পরিবার ও শিক্ষা

শহীদ মুহাম্মদ ফজলে এলাহী লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার বিবির হাটে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা মৃত মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন, মাতা আঞ্জুমারা খাতুন এখনও বেঁচে আছেন। ৫ ভাই ৫ বোনের মধ্যে ফজলে এলাহী অষ্টম। বড় ভাই মাওলানা নূরুল্লাহ মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করে সেখানেই শিক্ষক। চতুর্থ ভাই

www.pathagar.com

সিংগাপুর থাকেন। ছোট ভাই মাওলানা ওয়ালি উল্লাহ ঢাকায় ব্যবসা করেন। শহীদের এক ভাগিনা এ.আর হাফিজ উল্লাহ। তিনি ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন জেলা সভাপতি। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। ভাই বোন সহ পরিবারের সকলেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত। ফজলে এলাহী ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত নিজস্ব এলাকায় পড়ালেখার পর মান সম্পন্ন শিক্ষার লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টুমচর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এরপর লক্ষ্মীপুর আলীয়ায় ভর্তি হন। লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল পরীক্ষার ফল প্রার্থী ছিল। ফজলে এলাহী ছিল একজন কণ্ঠশিল্পী। গানে গানে দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে সঙ্গি সাথীদের অনুপ্রাণিত করতেন।

শাহাদাতের ঘটনা

শহীদ ফজলে এলাহী ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী ছিলেন এবং একটি উপশাখার সভাপতি হিসাবে তৎপরতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিল বি.এন.পি। এ দেশে যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের কেউ হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শিক শত্রু। তারা ইসলামের প্রত্যক্ষ বিরোধী। আবার কেউ হচ্ছে ইসলামের রাজনৈতিক শত্রু। তারা হলো ইসলামের পরোক্ষ বিরোধী। বি.এন.পি ভারত বিরোধীতার মোড়কে ইসলামী সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় অথবা ক্ষমতায় যেতে চায়। তাই এই ধরনের রাজনৈতিক ষ্টান্ডবাজীর মাধ্যমে সুযোগ মত ইসলামী আন্দোলনের উপর আঘাত হানতে তারা ভুল করেনা।

১৯৯৫ সালে ৩ ডিসেম্বর বি.এন.পি ও ছাত্র দল শহরে মিছিল করছে। জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর শ্লোগান দিচ্ছে। শিবির ধর জবাই কর, সকাল বিকাল নাস্তা কর। চক বাজারে ইসলামী ছাত্র শিবিরের অফিস ছিল। তৎকালীন শিবিরের জেলা সেক্রেটারী জহিরুল ইসলাম ও ফজলে এলাহী সহ কিছু সংখ্যক নেতা কর্মী অফিসে অবস্থান করছে। হঠাৎ মাগরিবের নামাজের পর জঙ্গী মিছিলটি উত্তর তেমুহনী থেকে ফিরে এসে শিবির অফিস আক্রমন করে। মুহুর্মুহু বোমার আঘাতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। শিবির সেক্রেটারী জহিরুল ইসলামের নেতৃত্বে আল্লাহর সৈনিক ফজলে এলাহী সহ আন্দোলনের কর্মীরা সন্ত্রাসীদের মুকাবিলা করে তাদেরকে পিছু হটাতে বাধ্য করে। তারা পালিয়ে যাওয়ার পরই

www.pathagar.com

ফজলে এলাহীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। তাঁর মাথার অগ্রভাগে মারাত্মক আঘাতে চুরমার হয়ে যায়। ফিনকি দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত বের হচ্ছে। ফজলে এলাহী আল্লাহ আল্লাহ এং উহু উহু শব্দ ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি। ব্যস্ততম চক বাজার এলাকা জনমানব শুন্য হয়ে গেল। কোন রিক্সা ও পাওয়া গেল না। দুই জন ফজলে এলাহীকে নিয়ে একটি খালি রিক্সায় উঠল। আর শিবিরের জেলা সেক্রেটারী জহিরুল ইসলাম নিজে রিক্সা চালিয়ে মুমূর্ষু ফজলে এলাহীকে লক্ষীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেল। ভর্তি করা হল হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তার জানাল রোগীর অবস্থা আশংকাজনক। তাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। এমন সময় হঠাৎ ছাত্র দলের ঘাতকরা হাসপাতালের পিছন দিক থেকে হামলা চালায়। প্রচন্ড বোমার আঘাতে হাসপাতালের রোগীরা চিৎকার করে উঠল। তখন জহিরুল ইসলাম আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু সন্ত্রাসীরা জহিরুল ইসলামকে রড, লাঠি, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। ইতিমধ্যে জামায়াত ও শিবিরের নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে গিয়ে দেখল ফজলে এলাহী ও জহিরুল ইসলামের অবস্থা আশংকাজনক। উভয়কে এ্যাম্বুলেন্সে উঠান হল। হঠাৎ দেখে গেল ফজলে এলাহীর সেলাইন বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার ফজলে এলাহীর হার্ট ধরে চুপ হয়ে গেল। শহীদ ফজলে এলাহী সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে রাত ৮.৩০ মিনিটের সময় মহান মালিকের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। শুনার সাথে সাথেই সকলে ঢুকরে কেঁদে উঠল। ফজলে এলাহীকে এ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে জহিরুল ইসলামকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হল। দুঃখ, ব্যথা বেদনায় এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হল। কেউ চিৎকার করে প্রতিশোধের প্রত্যয় ঘোষণা করছে। কেউ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না বলে শ্লোগান দিচ্ছে। তখন এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যা সামাল দেয়া নেতৃবৃন্দের জন্য কঠিন ছিল। শহীদি মৃত্যু মুমিনের কাম্য। শহীদ ফজলে এলাহী বলতেন, "আল্লাহ আমাকে শহীদ করলে আমি বেহেস্তে যাব।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই শাহাদাতের তামান্না কবুল করেছেন।

শহীদের জানাযা

শহীদ ফজলে এলাহীর প্রথম নামাজে জানাযা লক্ষীপুর চক বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জানাযায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা এহসানুল মাহবুব যুবায়ের, জামায়াত ও শিবিরের নেৃতবৃন্দ সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

জানাযা হাজির হাট বাজার, তৃতীয় জানাযা আলেক জান্ডার, চতুর্থ জানাযা বিবিরহাট হাই স্কুল মাঠে ও সর্বশেষ জানাযা গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে দাফন করা হয়। শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা এহসানুল মাহবুব যুবায়ের শহীদের ঘরে গেলেন। তখন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মায়ের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়। শিবির নেতা যোবায়ের তার মাকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, আপনার এক ছেলে চলে গেছে, আমরা আপনার অনেক ছেলে আছি।" তখন শহীদের গর্বিত মা বলেছিলেন, "আমার ফজলে এলাহী যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়েছে, সে আদর্শ যেন বাস্তবায়ন হয়।"

কর্মসূচি পালন

৫ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুর শহীদ ফজলে এলাহীর নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে হরতাল পালন করা হয়। এক অভাবনীয় হরতাল পালিত হয় গোটা লক্ষ্মীপুর জেলায়। দোয়া দিবস সহ শহীদের জীবনের উপর ব্যাপক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মাস ব্যাপি। ইসলামের শত্রুদের গডফাদার সহ সহযোগীরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। শহীদের রক্তের বদলা নিতে উত্তরসূরীরা যেন সকল অবস্থায় দ্বীন কায়েমের এই ময়দানে সাহসী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। আমিন!

শহীদ আহমদ যায়েদ

শাহাদাতের চেতনায় যার মন ব্যাকুল

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আহমদ যায়েদ ১৯৮৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঈদুল ফিতরের দিন জন্ম গ্রহণ করেন। শহীদের পিতা মাষ্টার মনির আহমদ। মাতা কুলসুম নূর (মরিয়ম) জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন)। দাদা শহীদ সুফী আহমদ এবং এক চাচা শহীদ রফিক আহমদ। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা উভয়কে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে। নানা মাষ্টার সফিক উল্লাহ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন এম.পি। ৫ ভাই ৬ বোন। ভাইদের মধ্যে আহমদ যায়েদ চতুর্থ। ভাই

www.pathagar.com

বোনদের মাঝে অষ্টম। ভাই বোন সবাই ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট ভাই আহমদ সালমান ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা উত্তরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য। ভগ্নিপতিরা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ করে দুই ভগ্নিপতি জনাব আবুল খায়ের ও সর্দার সৈয়দ আহমদ শিবিরের জেলা সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে জনাব আবুল খায়ের উত্তরা থানা জামায়াতের ৪নং ওয়ার্ড সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এবং সর্দার সৈয়দ আহমদ লক্ষ্মীপুর শহর সাংগঠনিক থানার নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন। এক কথায় বলা যায় শহীদের পিতৃ ও মাতৃকূল ইসলামী আন্দোলনের এক পারিবারিক দূর্গ।

শহীদি তামান্নায় ব্যাকুল যে জীবন

শহীদ আহমদ যায়েদ ছোটকাল থেকেই ইসলামের প্রতি ছিল একান্তভাবে আসক্ত। পারিবারিক ভাবে ইসলামী চেতনায় তৈরী হতে থাকে। বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে পরিচিত হতে থাকে। প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে বিভিন্ন দিকে। একদিকে মেধাবী ছাত্র অপর দিকে কণ্ঠশিল্পী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে যায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জীবনের মিশন হিসাবে গ্রহন করে নিয়েছিল। শহীদ আহমদ যায়েদ দাওয়াতের কাজে সকল বাধাকে উপেক্ষা করে ছাত্রদের কাছে ছুটে যেত। শাহাদাতের আগের দিনেও দাওয়াতী কাজ করেছেন রাত ৯টা পর্যন্ত।

তার আম্মাকে বলত, "আমি শহীদ হলে আপনি কাঁদবেন না। আমাকে দু'বছর পূর্বে বিষধর সাপ দংশন করেছিল, তখন আমি মরে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আল্লাহ। অতএব তুমি আমার জন্য দুঃখ করবে না।" মামার লেখা (কণ্ঠশিল্পি মাওলানা তারেক মনোওয়ার হোসাইন) যে গানটি প্রায়ই গাইত 'ওমা কাঁদিস না তুই সে ছেলেটির জন্য, খোদার পথে জীবন দিয়ে হলে সেজন ধন্য।' সে তার বন্ধুদেরকে বলত "আমার জীবনের বিনিময়ে যদি লক্ষ্মীপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে কাজে জীবন দিতে আমি প্রস্তুত রয়েছি। তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে। আল্লাহর কাছে আমার জীবনের এই ফরিয়াদ আমাকে শহীদের মিছিলে শামিল করিও।" শিল্পী হিসাবে অনেক গানের মধ্যে এটা গাইত "কোরবান করে দেবরে এ জীবন, এ ভূবনে কে আর আছেরে আপন।" আল্লাহ তাঁর এ আকুতিকে কবুল করে শহীদের কাতারে শামিল করেছেন।

www.pathagar.com

কিভাবে শহীদ হলো

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। বাংলাদেশকে সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সারা বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর হামলা, মামলা ও আক্রমন পরিচালনা করতে থাকে। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নারায়নগঞ্জ সহ কয়েক জেলায় গডফাদার ও তাদের বাহিনী নারকীয় তান্ডব চালায়। তৎকালীন সরকারের ছত্রছায়ায় গডফাদারের বাহিনী লক্ষ্মীপুরকে মৃত্যুপুরীতে পরিনত করে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লাশগুম ও হত্যাকৃত লাশকে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেয়া নিত্যদিনের সংবাদের শিরোনাম হয়ে যায়। এর ধারাবাহিকতায় শিবির নেতা কর্মীদের উপর হামলা, মামলা ও নির্যাতন চলতে থাকে। ১৭ আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখে এই জুলুমের প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্রশিবির একটি শান্তি পূর্ণ মিছিল বের করে। গো-হাটায় মিছিল শেষ করার পর ঘরমুখো শিবির কর্মীদের উপর আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগ্নেয়াস্ত্র, রামদা, চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি, হকিস্টিক দিয়ে নির্বিচারে আঘাত হানতে থাকে শিবির কর্মীদেরকে। একের পর এক আহত হতে থাকে শিবির নেতা কর্মীরা। চন্দ্রগঞ্জের শিবির নেতা নূর নবীর সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। চোখ হারায় শিবির কর্মী জাহাঙ্গীর, নাছির ও আলমগীর। এমতাবস্থায় শিবিরের সকলেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিশোর আহমদ যায়েদকে একা পেয়ে সন্ত্রাসীরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। গুলি চালায় তার উপর। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আঘাতের পর আঘাতে তার সমস্ত শরীর জর্জরিত হয়ে যায়। হাতুড়ির আঘাতে মাথার খুলি ভেঙ্গে মগজ বের হয়ে যায়। তার বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে দেয়। মুমূর্ষু যায়েদকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নিলে ডাক্তারগন চিকিৎসায় অপারগতা প্রকাশ করে। নোয়াখালী সদর হাসপাতালে নেয়ার ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে বিকেল চারটায় যায়েদ সকলকে কাঁদিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়। মহান রব যেন শহীদ আহমদ যায়েদের কামনাকে কবুল করেন।

শহীদ আহমদ যায়েদের জানাজা

শহীদ যায়েদের শাহাদাতের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তৌহীদি জনতা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত শহরের দিকে আসতে থাকে। জানাযা হওয়ার কথা ছিল চক বাজার জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে। কিন্তু আওয়ামী প্রশাসন কোন অবস্থায়

www.pathagar.com

হাজার হাজার মানুষের জনস্রোতকে সুষ্ঠু ভাবে শহরের কেন্দ্র চকে জানাযার নামাজ পড়তে দেবে না। প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে শতশত পুলিশ দিয়ে শহর অবরোধ করে রাখে। পুলিশ প্রশাসন ও আওয়ামী অস্ত্রধারীরা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহন করে। নোয়াখালী থেকে শহীদের কফিনকে নিয়ে চকের দিকে যেতে দেওয়া হলো না। গুলি ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে গণজোয়ারকে চকবাজারের দিকে অগ্রসর হতে দিলনা। এতে জামায়াত শিবিরের অনেকেই আহত হয়। ফলে শহরের প্রধান সেতু থেকে শহীদের কফিন নিয়ে শ্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে দারুল আমান একাডেমীতে নিয়ে যায়। একাডেমীর নিকটেই শহীদের কফিন নিজ বাড়ীতে পৌঁছার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে । শহীদের আম্মা কফিনের দিকে তাকিয়ে না কেঁদে তিনি বলেছিলেন, "আমি শহীদের মা হতে পেরে গর্বিত। আল্লাহ আমার যায়েদকে কবুল করুন।" শহীদের গর্বিত পিতা আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "হে পরোয়ার দেগার তোমার সন্তুষ্টি আমাদের সন্তুষ্টি। আমার যায়েদকে শাহাদাতের মর্যাদা দান কর।" বড় ভাই ইকবাল হোসাইন বলেন "আমাদের কলিজার টুকরা যায়েদের শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের ও জান্নাতের পথে চলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।" শহীদের জানাযার জন্য দারুল আমান একাডেমীর সামনে রাখা হয়। জানাযা পূর্ব সমাবেশে শহীদের নানা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মাষ্টার সফিক উল্লাহ শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে আবেগময়ী ভাষণ দিলেন। তারপর ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ সাইদুর রহমান শহীদের পথ ধরে ইসলামী আন্দোলনের কাজে এগিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। জানাযার ইমামতি করলেন শহীদের সম্মানিত খালু বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ইষ্ট লন্ডন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোঃ আবদুল কাইয়ূম। পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হলো আন্দোলনের এ মহান সৈনিককে। দাফন শেষে উপস্থিত সকল নিয়ে মুনাজাত পরিচালনা করেন শহীদের মামা প্রখ্যাত মুফাচ্ছিরে কুরআন তারেক মনোওয়ার হোসাইন। শহীদের গোটা পরিবার পিতা, মাতা, ভাই-বোন ও ভগ্নিপতি সহ যেন সবর করে ইসলামী আন্দোলনে দাবী পূরণ করতে পারেন, মহান আল্লাহর দরবারে এ কামনাই করছি। আমিন!

www.pathagar.com

শহীদ কামাল হোসেন
ইসলামের সৈনিকদের পাহারাদার

শহীদ কামাল হোসেন ৭নং বাঙ্গা খাঁ ইউনিয়নের মিরিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম মোঃ রহমত উল্লাহ। পিতা বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর একজন কর্মচারী। তিন ভাই দুই বোন এর মধ্যে তার অবস্থান তৃতীয়। ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। নিরীহ একটি সাধারণ পরিবারে সে জন্ম গ্রহণ করেছে। শহীদের গর্বিত পিতার বর্ণনা থেকে জানা যায় ছোট বেলা থেকে তাকে আদর্শ মানের ছেলে হিসাবে দেখেছে। সব সময় হাসিমুখে কথা বলত। শরীর স্বাস্থ্য ও রূপে গুনে অসাধারণ হওয়ার কারণে সকলেই তাকে ভালবাসত। ছোটকাল থেকেই নামাজ পড়ত ও মা বাবার জন্য দো'য়া করত। মুখ দিয়ে কখনও খারাপ কথা বের হতো না। চলাফেরা ছিল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হয় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শাহাদাতের জন্য বেছে নিয়েছেন। তা না হলে এ বয়সে এত গুন থাকতে পারেনা।

মা বাবা কামালকে আদর করে ডাকতেন হৃদয়। বিশাল মন আর অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, মা-বাবা শিক্ষক এবং সংগঠনের ভাইদেরকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন তিনি। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে জীবন গড়েছিলেন তারই অনুকরণে চলার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। গরীব ও মুহতাজ শ্রেণির লোকেরাই বেশী বেশী করে রাসুলুল্লাহ (স) ইত্তেবা বা আনুগত্য করেছিল। ঈমান ও বিশ্বাস তাঁদের সকল সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে আলোড়িত করে দিয়েছিল। শহীদ কামাল সাহাবাদের উত্তরসূরী হিসাবে নিজেকে এভাবেই তৈরী করার কাজে নিয়োজিত ছিল।

শিক্ষায় কৃতিত্ব

শহীদ কামাল হোসেনের মেধার বিকাশ ঘটেছিল ছোটকাল থেকেই। পড়ালেখায় ছিল খুবই মনোযোগী। সাথীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে ভাল ছাত্র হওয়ার চেষ্টা ছিল নিরন্তর। শহীদ কামালের পিতা বলেছিল "কামাল আমার সাধারণ ছেলে নয়, সে ছিল আমার রত্ন।" ১৯৯৭ সালে সে মকরদ্ধজ সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাখিল পাশ করেন। ১৯৯৯ সালে লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আলিম পাশ করেন। শহীদ কামাল হোসেন ছাত্র শিক্ষক ও বন্ধু মহলে ছিল সকলের প্রিয়। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে ছিল খুবই আন্তরিক। শহীদ কামাল হোসেন ছিলেন জিহাদী কাফেলার নিবেদিত প্রাণ সৈনিক।

www.pathagar.com

কিভাবে শহীদ হলো

আওয়ামী বাকশালীর ক্ষমতার তান্ডব চলছিল লক্ষ্মীপুরে। মামলা, হামলা, নির্যাতন, হত্যা গড ফাদারের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল। মানুষের জান মালের নিরাপত্তা ছিলনা। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলন ছিল টার্গেট। ইসলামী ছাত্র শিবিরের শক্তিকে দূর্বল করে দিতে পারলেই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা সম্ভব হবে। ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার অবস্থা তৈরী হবে। তাই সন্ত্রাসী চক্র নির্যাতন ও হত্যা চালিয়ে যেতে থাকে। লক্ষ্মীপুর জেলা সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিনত হয়। বিশেষ করে ক্ষমতাশীন চক্রের তান্ডবে লক্ষ্মীপুর শহর সন্ধ্যার পর ভূতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করত। রাতভর চলত গোলা বারুদের বিষ্ফোরণ, মদজুয়া, নারী অপহরণের হলি খেলা। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, অপহরণ ও নির্যাতনের স্বীকার হয়ে সাধারণ মানুষের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। জান মালের নিরাপত্তাহীন হয়ে এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে অনেকেই। নিরীহ মানুষের কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিলনা চাঁদা দেয়া ছাড়া। বি.এন.পি নেতা এডভোকেট নুরুল ইসলামকে রাতের অন্ধকারে বাসা থেকে অপহরণ করে গডফাদারের নির্দেশে নির্মম ভাবে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্ধী করে নদীতে নিক্ষেপ করা হলো। গডফাদারের নির্দেশে প্রশাসন পরিচালিত হত। এমতাবস্থায় জামায়াত ও শিবিরের কর্মীরা লক্ষ্মীপুর শহরের দারুল আমান একাডেমীতে অবস্থান গ্রহণ করে। দুই শতাধিক মর্দে মুজাহিদ জামায়াত শিবিরের অফিস ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার শপথ গ্রহন করে। দিবারাত্রি গ্রুপ ভিত্তিক পাহারা বসাল। এ কাফেলার সাথে ছিল কামাল ও তার বড় ভাই আবদুর রহীম। "আল্লাহ দু'ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুনে পোড়াবেনা যাদের আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি পড়ে, আর যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারাদারি করে।" রাসূল (স.) এর এই হাদীসের জ্বলন্ত স্বাক্ষী হচ্ছে শহীদ কামাল হোসেন। শহীদ আহমদ যায়েদ শাহাদাতের ৪০ দিন পর ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সাল একাডেমীতে পুনরায় আক্রমন হতে পারে সংবাদের ভিত্তিতে পাহারাদারী চলতে থাকে। শহীদ কামাল কর্মী হয়ে ও একটি গ্রুপ পরিচালনা করত। রাত তখন ১টা শহীদ কামাল মসজিদে বসে জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নিজে শিবিরের সাথী হবেন এবং লক্ষ্মীপুর থেকে পড়ালেখা করবেন। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পরই একটি বুলেট এসে শহীদ কামাল হোসেনের

www.pathagar.com

স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। আহত কামাল হোসেনকে রাতেই হাসপাতালে নেয়ার পথে তার বড় ভাই আবদুর রহিমের কোলেই চির নিদ্রায় শায়িত হল। শহীদ জায়েদের শাহাদাতের পর দুই ভাই পাহারাদারীর জন্য লক্ষ্মীপুর এসে ছোট ভাই শাহাদাত বরণ করলেন। এ পরিবারটি এখনও ইসলামের শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত। ছোট ভাইটির উপর অনেক যুলুম করা হয়েছে। যার ফলে সে এখন বুদ্ধি প্রতিবন্ধি হয়ে পড়েছে।

শহীদের জানাযা

শহীদ কামাল হোসেন হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করেছিল। তাই তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুটে আসে শহীদের বাড়িতে। বাড়ির নিকটেই রাস্তা সংলগ্ন খোলা ময়দানে জানাযার স্থান নির্ধারণ করা হল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মাঝে ও অগনিত মানুষ জানাযায় অংশগ্রহণ করে। জামায়াত ও শিবিরের নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর জানাযার নামাজ সমাপ্ত করা হয়। নিজস্ব কবরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। দ্বীনের পথে পাহারাদারী করতে এসে জীবন দিলেন। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন। আমিন!

শহীদ মাহমুদুল হাসান

শহীদ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ী যুবক

দুনিয়াতে যা ঘটবে আল্লাহ তায়ালা তা লিখে রেখেছেন। তার কোন পরিবর্তন বা বেত্যয় ঘটবে না। মানুষের সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকায় নিজকে দুনিয়ার প্রয়োজনে তাড়িয়ে বেড়ায়। অজ্ঞতার মাঝে হাবুডুবু না খেয়ে আল্লাহর দেয়া ওহীর জ্ঞানের ফলশ্রুতিতে কুরআনের শিক্ষার দিকে ছুটে চলাই মানুষের একমাত্র পথ। শহীদ মাহমুদুল হাসান সেই রাজপথের সন্ধান পেয়ে পৌঁছে গেছেন আরশের মালিক মহান আল্লাহর দরবারে। রাব্বুল আলামীন তাঁর সেই সর্বোচ্চ কুরবাণীকে কবুল করুন। শহীদ মাহমুদুল হাসান লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবাণীগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আবদুজ্জাহের বেঁচে নেই। মাতা পুত্র শোক নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন। তিন ভাই তিন বোন। ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। ছোট কাল থেকেই ছটফটে ছিল মাহমুদ। স্কুল জীবনেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে ছাত্র, শিক্ষক, আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজন তাকে খুবই আদর করত। পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে তার ছিল গভীর সম্পর্ক। সে যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি আসত, আশে পাশের সবার সাথে দেখা করত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশেই রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই খারাপ। শহীদ হওয়ার কিছু দিন পূর্বে মাহমুদ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্তৃক মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়। রডের আঘাতে রক্তাক্ত হয়। সুস্থ্য হওয়ার পর বাড়িতে আসলে মা ছেলের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন মা ছেলেকে কিছু দিনের জন্য বাড়িতে থাকতে বলে। তখন ছেলে মাকে বলেছিল রমজানের ১০ তারিখে বাড়িতে আসবে। মা ছেলেকে যখন সাবধানে থাকার জন্য বলেছিল তখন মাহমুদ বলেছিল "মা শহীদের মৃত্যু সবচেয়ে মর্যাদার মৃত্যু। এই মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে জুটে। মা তুমি দোয়া করিও যেন বীরের মত আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারি।" এ কথা গুলো শুনে মা ছেলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো এবং মা হয়ত ভেবেছে আসলেই কি আমার ছেলে শহীদ হয়ে যাবে? মাহমুদুল হাসান ১০ তারিখেই বাড়ি এসেছে, তবে জীবিত নয় শহীদ হয়ে।

শাহাদাতের বিবরণ

মেধাবী ছাত্র শহীদ মাহমুদুল হাসান লক্ষ্মীপুর থেকে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরর সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য ভর্তি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা শেষ করে মায়ের কোলে ফিরে আসবে, কেন তার এই স্বপ্ন সাধ পূরণ হলো না? কে এর জবাব দেবে?

১৯৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নির্মম হত্যাকান্ডের এক কালো অধ্যায়ের রক্তাক্ত স্মৃতি। এই দিন পবিত্র রমজান মাস হওয়ার কারণে ছাত্র ছাত্রীরা যার যার পড়ালেখা ও ইবাদতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ করে আওয়ামীলীগের সোনার ছেলে ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা সোহারাওয়ার্দী হল দখলের পরিকল্পনা করে। তৎকালীন ছাত্রলীগের সেক্রেটারীর নেতৃত্বে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এ.কে-৪৭, এস.এম.জি, কাটা রাইফেল সহ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল আক্রমন করে। শত শত পুলিশের সামনে তারা ফিল্মি কায়দায় ব্রাশ ফায়ার করতে করতে হলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। চর দখলের ন্যায় ছাত্রলীগের এই অভিযানের খবর পেয়ে আলাওল ও এ.এফ রহমান হলে অবস্থানরত ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মীরা সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

আল্লাহর অকুতভয় সৈনিকরা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তখন শয়তানের প্রেতাত্মা ছাত্রলীগের গুন্ডাবাহিনী মিছিলকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গুলি করতে থাকে। সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদ। ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরর বাংলা বিভাগের মেধাবী ছাত্র ও ফতেহপুর শাখা শিবিরের সেক্রেটারী রহিম উদ্দিন ও ফাইন্যান্স বিভাগের মেধাবী ছাত্র মাহমুদুল হাসান। সে দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মসজিদের সামনের পড়ে থাকা নিস্তব্ধ মাহমুদ কি অন্যায় করেছিল? জবাব চাই আওয়ামী সরকার ও প্রশাসনের কাছে। কেন আওয়ামী দূর্বৃত্তরা বিনা কারণে বিনা দ্বিধায় পাখির মত গুলি করে এদেরকে হত্যা করছে? একদিন এর জবাব তাদেরকে দিতে হবে। শহীদের কফিন যখন বাড়িতে পৌছল পিতার কন্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। দুঃখ ব্যথা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ৬ মাস পরেই তিনি মারা যান। আত্মিয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই হতবাক হয়ে গেল। ইসলামী আন্দোলনের তরুন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে জাতি হারাল।

শহীদের জানাযা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর হারুনুর রশিদ শহীদ মাহমুদুল হাসানের হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন "শুরু থেকে চটফটে ও মেধাবী হওয়ার কারণে সে অন্যদের চাইতে আমার কাছে প্রিয় ছিল। পরে জানলাম অন্যান্য শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছেও অনুরূপ ভাবে সে প্রিয় ছিল। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন "যাকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হলো, যে ক্যাম্পাসে ছেলেটি বসবাস করত সেখানে জানাযা পড়তে ও দেয়া হলোন।" যে কারণে জানাযার নামাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি শহীদ মাহমুদের সম্মানিত শিক্ষক। চট্টগ্রামে হাজার হাজার ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে শহীদের নামাজের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এলাকায় আসার পরিবর্তে লাশ হয়ে ফিরে আসল লক্ষ্মীপুরে। লক্ষ্মীপুরের ভবানীগঞ্জে জানাযার নামাজ হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জু লক্ষ্মীপুর এসে মা-বাবাকে শান্তনা দিয়েছিলেন। শহীদের ওয়াসিলায় মা-বাবাকে মহা পুরস্কার পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেছিলেন। মাহমুদুল হাসানকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন। আমিন!

www.pathagar.com

শহীদ এ.এফ.এম মহসীন

ইসলামী আন্দোলনে সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতা

শহীদ মহসীন একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ আমান উল্লাহ। পাঁচ ভাই তিন বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ছোট কাল থেকেই প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছিল। ভাল ছাত্র হিসাবে সুনাম যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি ভাবে বুদ্ধিতে ও ছিলেন অসাধারণ। আকর্ষনীয় সুদর্শন দেহাবয়ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। তার কথাবার্তা ও আচার-আচরনে মেধা ও বুদ্ধি মত্তার পরিচয় বহন করে। ছোট কালেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে যায়।

ছাত্র ও রাজনৈতিক জীবন

স্কুল জীবন থেকেই ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শহীদ মহসীন গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন । তিনি একদিকে পড়ালেখায় কৃতিত্ব অপর দিকে সাংগঠনিক কার্যক্রমে উন্নতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শহীদ মহসীনের সুনাম সুখ্যাতি ঢাকা এবং তার জেলা শহর লক্ষ্মীপুরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি সৌদি আরবের একটি এন.জি.ও ঘোষিত পুরষ্কার লাভ করেন। ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদক হয়েছিলেন। সংগঠনের কাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশের আনাছে কানাছে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যে কোন পরিস্থিতিকে সহজ ভাবে গ্রহন করে মুকাবিলা করতে তিনি সক্ষম ছিলেন। ছাত্র জীবন শেষ করেই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তিনি জামায়াতের সদস্য (রুকন) হিসাবে শপথ করেন। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাষ্টার সফিক উল্লাহর পক্ষে নিরলস ভাবে কাজ করেছিলেন। সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা করা, বক্তব্য রাখাসহ সকল কার্যক্রমে সাহসী ভূমিকা পালনে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাদেরকে তার কাজের জন্য বাছাই করে থাকেন,

www.pathagar.com

তাদের কৃতিত্ব, তাদের যোগ্যতা, তাদের সাহস, তাদের তৎপরতা ও ত্যাগ কুরবানীর উদাহরণ এভাবেই সৃষ্টি করে থাকেন। শহীদ মহসীন ছিলেন সকলের প্রিয় দায়িত্বশীল। তার ক্যারিয়ার গাইড লাইন আলোচনা ছিল উচ্চবিলাসী ধরনের। কিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করবেন তা শুনলে একজন রূপকার হিসাবে তাকে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী সমাজ গঠনে কিভাবে ভূমিকা পালন করবেন। পড়ালেখা শেষ করে ঢাকাতেই ব্যবসা শুরু করেন। মা-বাবা, ভাই-বোনদেরকে নিয়ে ঢাকাতেই থাকতেন। নারায়নগঞ্জের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। লক্ষ্মীপুরের সন্ত্রাসী বাহিনী মোঃ মহসীনকে ভাল করে জানত। তারা জানত মহসীন ছিল ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা, একজন প্রতিভাবান নেতৃত্বকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারা তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল বলে মনে করত। লক্ষ্মীপুরের গডফাদারের রক্ত পিপাশু বাহিনী জঘন্যতম কায়দায় মহসীনকে হত্যা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। হত্যা করেছে ফজলে এলাহী, আহমদ যায়েদ, মাহমুদুল হাসান সহ অনেককে।

রক্তসিক্ত সেই দিনটি

ছাত্রজীবন শেষ করেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে। ২০০০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মোঃ মহসীন একান্ত ব্যবসায়ীক কাজে লক্ষ্মীপুরে আসেন। তিনি লক্ষ্মীপুর এসে অধ্যাপক মোস্তাকুর রহমানের বাসায় গিয়েছিলেন। সেখানে ব্যবসা সম্পর্কে আলাপ হয়। বিকালে ৪টায় ব্যবসা সংক্রান্ত বৈঠক পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। বৈঠক শুরুর পর শহীদ মহসীন ব্যবসার পলিসি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। এমন সময় লক্ষ্মীপুরের সন্ত্রাসী ১৫/২০ জনের একটি গ্রুপ সশস্ত্র অবস্থায় সভাকক্ষে ঢুকে পড়ে। কক্ষে ঢুকেই সকলকে গালিগালাজ করতে থাকে। এক এক করে তল্লাসী করে কক্ষ থেকে বের করে দেয়। মহসীনকে তল্লাসী করে তার পকেটে একটি শিবিরের পকেট ডাইরী পায়। ডাইরী পেয়ে মহসীনকে অস্ত্রের মুখে কক্ষে

www.pathagar.com

জিম্মি করে রাখে। এরপর তারা মুহসীনকে সেখান থেকে মডেল স্কুলের একটি কক্ষে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে। আল্লাহর পথে আপোষহীন মহসীন পাশবিক নির্যাতনে একবারের জন্য ও তাদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করেননি। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা হাত, পায়ে ও বুকে গুলি করে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। মহসীনের রক্তের স্রোত মডেল হাই স্কুল কক্ষ ভেসে যায়। এ অবস্থায় একজন সন্ত্রাসী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ফয়েজ আহমদকে জানায়, আপনাদের একজন মুমূর্ষু অবস্থায় লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে আছে। তখন ডা. ফয়েজ আহমদ, ডা. সেলিমকে সদর হাসপাতালে পাঠান। ততক্ষনে মহসীনের সুঠাম দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়। হাসপাতালে নেয়ার পর মহসীন ডাক্তারকে বলেন "আমার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।" আমাকে রক্ত দিয়ে বাঁচান। তারপর বেড থেকে উঠে ভাগনির বাসায় ফোন করে বললেন, "রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ, তাড়াতাড়ি রক্ত দিয়ে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা কর।" রক্ত নিয়ে আসলো কিন্তু আর দিতে পারলনা। আল্লাহ, আল্লাহ আর কালেমা পড়তে পড়তে জান্নাতের পথে পাড়ি জমালেন মহসীন। কি অপরাধ ছিল মহসীনের? আশা আকাঙ্খার এই দোলাচলে একটি উজ্জল নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি সকলকেই হতচকিত ও ব্যথিত করে দিল। একটি প্রতিভা ঝরে গেল শুধুমাত্র ইসলামের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে। শহীদের মায়ের আর্তনাদ, পিতার ক্রন্দন, ভাই-বোনদের চিৎকার ও সঙ্গী সাথীদের ব্যথা বেদনার অবসান কি ঘটবে? যে উদ্দেশ্যে তিনি জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে গেছেন, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই তার অবসান ঘটতে পারে।

শহীদের জানাযা

যখন মোঃ মহসীন শহীদ হয়, তখন লক্ষ্মীপুর শহরে কারো জন্য কাঁদাও যেন ছিল অপরাধ। লক্ষ্মীপুর শহর সন্ত্রাসীদের জন্য অভয়ারণ্যে পরিনত হয়। শহীদের শুভাকাঙ্খীরা নিভৃতে কান্না করা ছাড়া কিছু করার সাহস ছিলনা। প্রশাসন একজন গডফাদারের অংগুলির নির্দেশে পরিচালিত হত। শহীদের জানাযা লক্ষ্মীপুর শহরে করতে দেয়া হলোনা। ইসলামী ছাত্র শিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.pathagar.com

এহসানুল মাহবুব যুবায়েরকে টেলিফোনে জানান হলো মহসীনের শাহাদাতের খবর। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সভাপতি লক্ষ্মীপুরের জনাব মাওলানা মফিজুল ইসলামকে নিয়ে নাখাল পাড়ায় শহীদের বাসায় উপস্থিত হয়। সেখানে শহীদের পিতা, মাতা, ভাই-বোনদের ক্রন্দনে এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে জনাব লুৎফুর রহমান ও নোয়াখালী জেলা সভাপতি আবু আলী আয়াজ লক্ষ্মীপুরে মহসীনের বাড়ীতে আসেন এবং শহীদের বাড়ীতে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন। গোটা বাংলাদেশে মহসীন হত্যার প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু লক্ষ্মীপুর শহরে শহীদের জন্য শুধুমাত্র দোয়া করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হয়নি।

মামলার রায়

শহীদ এ.এফ.এম মহসীন নির্মম ভাবে হত্যার পর মামলা করা হয়। লক্ষ্মীপুরে জজ কোর্ট থেকে বিজ্ঞ আদালত ২০০৪ সালে মামলার রায় প্রদান করেন। এতে ৫ জনের ফাঁসী ও ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। আদালতের এ রায়ের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সাথী ও পরিবারের লোকেরা কিছুটা হলেও শান্তনা লাভ করতে সক্ষম হয়। ফাইনাল রায়ে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই খুনীদের যথাযথ শাস্তি দিবেন।

মৃত্যু পূর্বে শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ হত্যাকরীদের উদ্দেশ্যে বলেন- "তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জান? তোমরা আমাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছ।"

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
মাওলানা মোঃ মহিব উল্লাহ
দায়ী ইলাল্লাহর পথে দৃঢ় চেতা

একটা মজবুত ও সুন্দর বিল্ডিং তৈরীর জন্য শক্তিশালী ভিত্তি তার পূর্বশর্ত। কিন্তু ভিত্তি বা ফাউন্ডেশনের ইট গুলো মাটির নিচে থাকে, সেগুলো কেউ কোন দিন দেখেনা। তার অবস্থান দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। কেউ চিন্তাও করেনা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি নন্দন এই উচু ইমারতটি। কবি কবিতা লেখে ইমারতের কারুকার্য খচিত সৌন্দর্যকে নিয়ে। তাজমহলের শিল্প নৈপন্ন দেখে পৃথিবীর মানুষ বিমোহিত হয়। কিন্তু এর অন্তর্ণিহিত বিষয় থেকে যায় অজ্ঞাতে। ইতিহাসের পাতায় যুগের পর যুগ তা লিপিবদ্ধ থাকে। এরপরও অনেক স্মৃতি মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়।

রক্ত ক্ষরণের ইতিকথা

লক্ষ্মীপুরে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে যাদের ভূমিকায় ছিল উজ্জিবিত, এদের একজন হচ্ছে মাওলানা মহিব উল্লাহ। ফাজেল পাশ করার পর তিনি লক্ষ্মীপুর কলেজে ভর্তি হন। তার সুন্দর ব্যবহার, আকর্ষণীয় বক্তব্য, নেতৃত্বের গুনাবলী সহ বহুমুখী প্রতিভার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও নেতৃবৃন্দের কাছে পরিচিত হয়ে গেল। দেশের এক কঠিন মূহুর্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র। দেশে এক অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিবেশে মাওলানা মহিব উল্লাহকে ধরে লক্ষ্মীপুর নিয়ে আসল। শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। গভীর রাতে পিছনের দিকে দুই হাত নিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। হা করে মুখের ভিতর দড়ি দিয়ে ঘাড়ের সাথে বাঁধা হলো মজবুত করে। একটি কান কাটা হলো। পুরুষাঙ্গ কেউ কাটতে বললেও তা কাটলনা। পিছনের দিক থেকে বেয়ানট ডুকিয়ে দিয়ে লক্ষ্মীপুর মাঝ বাজারের পুল থেকে খালে ফেল দিল। হত্যাকারীরা লাইট দিয়ে দেখল ডুবে গেছে মহিব উল্লাহর বড় দেহটি। তারা একে অপরকে বলল ডুবে গেছে এবার চল। জীবন মৃত্যুর ফয়সালাকারী একমাত্র আল্লাহ। আমাদের দেশে বলে "রাখে আল্লাহ মারে কে?" মহিব উল্লাহ খালে পড়ে তার পা মাটিতে ঠেকেছে। হামাগুড়ি দিয়ে কিনারে চলে আসল। খালের পাড়ে ছিল অনেক

www.pathagar.com

গুলো গাছের গুড়ি। তার আড়ালে চলে গেলেন মহিব উল্লাহ। হত্যাকারীদের লাইটের আলো তিনি দেখলেন। কিন্তু তারা মহিব উল্লাহকে দেখলনা। ঘাতকরা চলে যাওয়ার পর মহিব উল্লাহ পুলের পিলারের সাথে ঘষতে ঘষতে হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। এরপর মুখের বাঁধন খুলে তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন। কানে হাত দিয়ে দেখলেন রক্ত জমাট বেধে গেছে। এখন আর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছেনা। পিঠে যে বেয়নট ডুকিয়ে দিয়েছিল সেটা সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করেনি, চামড়ার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হলেও সময় সময় প্রচন্ড ব্যথা করত। কারণ বেয়ানট অত্যন্ত বিষাক্ত। খালের ভিতর দিয়ে হেটে হেটে বাগবাড়ী পুলের নিকট গিয়ে রাস্তায় উঠল। বেয়ানটের ব্যথা উঠলে রাস্তায় শুয়ে পড়তেন। ব্যথা কমলেই আবার হাটতে শুরু করতেন। এভাবে ফজরের আজান শুরু হয়েছে। এ সময়েই বাড়িতে পৌঁছে যান তিনি। চিকিৎসা করাবেন কিভাবে। কোথাও নেয়া সম্ভব নয়। ঘরে ছিল জহর মোরা নামের একটা ঔষধ যা বাইন্না দোকানে পাওয়া যেত। তাঁর আম্মা ঐ ঔষধটি খাওয়ানোর সাথে সাথেই বেয়নটের ব্যথা বন্ধ হয়ে যায়। মহিব উল্লাহ আমাকে বলেছিলেন "আগুনে পানি ঢেলে দিলে যেমন আগুন নিভে যায়, জহর মোরা খাওয়ার পর অনুরূপভাবে আমার ব্যথা খতম হয়ে যায়"। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাওলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ্য হয়ে যান। আমি (লেখক) তখন রাজশাহী ছিলাম। তিনি আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে চলে যান। তারপর তাঁর পেশাগত জীবন সম্পর্কে বর্ণনা না করলেও এতটুকু বলা যায়, আল্লাহ তার বান্দাকে কিভাবে সাহায্য করবেন তা বুঝা কঠিন। তাঁর এই রক্তদান যেন বৃথা না যায়। মহান আল্লাহর দরবারে উত্তম যাযার জন্য মুনাজাত করছি।

www.pathagar.com

মাষ্টার মোঃ মমিনুল হক

বিচক্ষণ ও জাগ্রত বিবেক

চারদিকে আজ নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। মানবতার বিরুদ্ধে চলছে হত্যার মহা আয়োজন। কিন্তু তাদের মুখে রয়েছে শান্তির অমীয়বাণী। তারা পৃথিবীকে হানাহানি আর মারামারির কেন্দ্রে পরিনত করেছে। মানবতা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, উন্নয়ন আজ তাদের হাতে জিম্মী। এমনি এক কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা রক্ত দিয়ে তার মুকাবিলা করছে। পরকালের নাজাতের আশায় প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই পথে রাসুলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের অনুকরণের বেত্যয় ঘটলে কাঙ্খিত ফলাফল লাভে সংশয় সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মমিনুল হক রক্ত দেয়ার নজরানা পেশ করেছেন।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

মোঃ মমিনুল হক ১৯৬৪ সারের ১৩ ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মোঃ হাসমত উল্লাহ মাতা আঞ্জুমা খাতুন। উভয়ই না ফেরার দেশে চলে গেছেন। জন্মস্থান ৭নং বশিকপুর ইউনিয়ন, সদর, লক্ষীপুর। চার মেয়ে এক ছেলে। একমাত্র ছেলে মুজাহিদুল ইসলাম এ বছর আলিম পাশ করেছে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

মমিনুল হক ১৯৮০ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৯৪ সালে সি.ইন.এড্ পাশ করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর শিক্ষকতার পেশা বাদ দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে গ্রামের প্রসিদ্ধ পোদ্দার বাজারে মমিন ক্লথ ষ্টোরের মালিক। দ্বীনের দায়ী ও সফল ব্যবসায়ী হিসাবে বর্তমানে তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

সামাজিক কাজ

মমিনুল হক কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরেই বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত হতে পেরে উৎসাহ বোধ করছেন। যার ফলে তিনি ইউনিয়নের গণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে যান। এরপরে তিনি পোদ্দার বাজার ইসলামী পাঠাগারের দীর্ঘ দিন সেক্রেটারী ছিলেন। বর্তমানে পাঠাগারের সহসভাপতি। তিনি পশ্চিম শেরপুর

www.pathagar.com

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি। পশ্চিম শেরপুর ঈদগাহ মসজিদের সহসভাপতি। শেরপুর নূরিয়া মাদরাসা ও জামে মসজিদের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন। শেরপুর যুবকল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা হিসাবে ভূমিকা রাখছেন।

রাজনৈতিক জীবন

মমিনুল হক ১৯৭৮ সালে ইসলামী ছাত্র শিবিরে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে কর্মী হিসাবে স্কুল শাখার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১-৮৩ সাল পর্যন্ত খুলনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৮৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী হন। সে বছরই জামায়াতের কর্মী হন এবং ৭নং বশিকপুর ইউনিয়নের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসাবে শপথ গ্রহন করেন এবং লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে তিনি লক্ষ্মীপুর সদর পশ্চিমের সেক্রেটারী, পরবর্তীতে ১৯৯৭-৯৮ সালে উক্ত সাংগঠনিক থানা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে সদর পশ্চিম সাংগঠনিক থানা মজলিশে শূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য। তিনি ইসলামী আন্দোলনে ও বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত থাকার কারণে ইসলাম বিরোধী ও সামাজিক কাজের প্রতিহিংসার কারণে ২ বার গ্রেফতার হন। এতে করে প্রায় ৩মাস জেলের কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে।

রক্ত ঝরার দিনটি

১৯৮৯ সালের ২৭ অক্টোবর মমিনুল হক এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে বি.এন.পির সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ৮/১০ জন সন্ত্রাসী হকিষ্টিক, রামদা, কিরিচ ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে মধ্য বাঞ্চানগর এন আহমদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে মমিনুল হকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হকিষ্টিকের আঘাত রামদা ও কিরিচের কোপে হাত-পা সহ সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। একজন সিভিল পোষাকধারী পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চিকিৎসা

মৃমূর্ষু অবস্থায় মমিনুল হককে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ১০ দিন চিকিৎসার পর মোটামুটি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেন। যে কারণে বর্তমানেও তিনি প্রায়ই অসুস্থ্য হয়ে যান। তার এ রক্তকে কবুল করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন!

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ওমর ফারুক

দ্বীনের পথে রক্ত দান

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

মুহাম্মদ ওমর ফারুক ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বাঞ্ছানগর রৌশন আলী পন্ডিত বাড়ি। পিতা মুহাম্মদ রফিক উল্লাহ ১৯৯৩ সালের ৭ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। মাতা আখতারুন্নেছা আল্লাহর মেহেরবাণীতে এখনও বেঁচে আছেন। তিন ভাই সাত বোন। ভাই বোনদের মধ্যে ৬ষ্ঠ ও ভাইদের মধ্যে বড়। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে ছাত্র জীবন শেষ না হতেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে ওমর ফারুককে। ওমর ফারুক হচ্ছে সাবেক এম.পি ও জামায়াত নেতা মাষ্টার মোঃ শফিক উল্লাহ সাহেবের ভাতিজা।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

১৯৯২ সালে বি.এস.এস পাশ করেন। বি.এড পাশ করেন ২০০৬ সালে। পিতার মৃত্যুও পর মাদ্‌রাসাই দারুল আমান একাডেমীর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পান। বর্তমানেও ওমর ফারুক একই পেশায় নিয়োজিত। চাকুরীর পাশাপাশি ষ্টেশনারী ব্যবসা শুরু করেন। বিভিন্ন কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। শেষ পর্যায়ে হোটেল ব্যবসা শুরু করে ভাল করতে পারেনি। প্রত্যেক ব্যবসায় ধস নামে। বর্তমানে সকল ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মেঝো ভাই মাহবুবুর রহমান ব্যবসায়ী হিসাবে ভাল অবস্থানে রয়েছেন।

সামাজিক কাজ

ওমর ফারুক বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে ও জড়িত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি পৌর দোকান ভাড়টিয়া কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারী, লামচরি সাংস্কৃতিক সংসদের সহ-সভাপতি এবং লক্ষ্মীপুর ইসলামী পাঠাগার সমাজ কল্যাণ পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্র রাজনীতি

ওমর ফারুক স্কুল জীবন থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রাথমিক সদস্য হিসাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। কলেজে এসে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রথমে কলেজ সভাপতি, এরপর শহর

www.pathagar.com

সভাপতি সর্বশেষ জেলা সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধীদের বাধার মুখে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দায়িত্বের হক আদায়ে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা সাধনা করেন। শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে বিরোধীদের টার্গেটে পরিনত হয়েছিল।

সংঘর্ষের কারণ

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের মসনদে বি.এন.পি। ক্ষমতার দাপটে বিরোধীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার দিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার বিরোধিতায় সংঘাতের পথ বেচে নিয়েছে। যাদের কোন আদর্শ থাকেনা তারা ক্ষমতাকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। বাংলাদেশে এরই ধারাবাহিকতায় বার বার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়েছে। কলেজের প্রথম বর্ষের ভর্তির সময় সকল ছাত্র সংগঠন ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতা করার মানবিক অধিকার রয়েছে। লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজের শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে ও স্বাভাবিক ভাবে ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাধা দিচ্ছে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে তৎকালিন সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল। সংঘাত এড়িয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের অধিকার প্রয়োগে বদ্ধ পরিকর।

রক্তক্ষরণের ঘটনা

১৯৯১ সালের ১১ মে লক্ষ্মীপুর সরকারী আদর্শ সামাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে রাস্তায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৫/৭ কর্মীর উপর ছাত্রদলের ১৫/২০ জন সন্ত্রাসী আক্রমন চালায়। তাদের কাছে ছিল বোমা, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, লাঠি, রড ইত্যাদি। ওমর ফারুক তখন শিবিরের শহর সেক্রেটারী। সে খবর পেয়ে দ্রুত গো-হাটা থেকে সে দিকে এগিয়ে গেল। ওমর ফারুক গোডাউন রোড থেকে সামনে ব্রিজের গোড়ায় পৌঁছার সাথে সাথেই সন্ত্রাসীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বোমা ফাটিয়ে ত্রাশ সৃষ্টি করে। যাদের সাহায্যে ওমর ফারুক গিয়েছিল তারাও ভয়ে সরে গেল। একাকী ওমর ফারুককে আঘাতের পর আঘাতে রক্তাক্ত করে

www.pathagar.com

ফেলল। মাথায় ও মুখে দা ও কুড়ালের আঘাতে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। লাঠি ও রডের আঘাতে ডান হাতের হাড় ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। গোটা শরীর আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল। ওমর ফারুকের মূমুর্ষূ অবস্থা দেখে পিতার আর্তনাদ ভূলে যাওয়ার মতো নয়। দুঃখ, ব্যথা বেদনায় আমরা সকলেই যেন নির্বাক হয়ে গেলাম।

চিকিৎসা

মারাত্মক আহত অবস্থায় ওমর ফারুককে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে একদিন রাখার পর ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখান থেকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে এক সপ্তাহ রাখা হয়। সর্বমোট তিন মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর মোটামুটি সুস্থ্য হয়ে লক্ষ্মীপুর ফিরে আসে।

আল্লাহর নিকট উত্তম যাযা

আদর্শের বাস্তবায়নের প্রয়াশ শুধুমাত্র কল্পনা প্রসুত নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার অথবা আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়াস নিরন্তর না হলে তা ব্যর্থতার পর্যবসিত হবে। তাই আল্লাহর কাছে উত্তম যাযা পেতে হলে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সেই আদর্শের পথে টিকে থাকতে হবে। চালাতে হবে বিরামহীন সংগ্রাম, প্রতিটি রক্ত বিন্দুর এ দাবী পূরণ সকলের কাম্য।

www.pathagar.com

শিবির নেতা মাওলানা জহিরুল ইসলাম

সহজ সরল জীবনের বাস্তব উদাহরণ

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

মাওলানা জহিরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাষ্টার মোঃ ছাইদুল হক। তিনি ২০০৬ সালে ১০৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মাতার নাম ছিদ্দিকা খাতুন আল্লাহর মেহেরবাণীতে এখনও বেঁচে আছেন। ৩ ভাই ৪ বোনের মধ্যে জহিরুল ইসলাম সকলের ছোট। স্ত্রী কামরুন্নাহার ৪ মেয়ের জননী। জন্মস্থান হচ্ছে বাঙ্গাখাঁ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কাচারী বাড়ী, সদর লক্ষ্মীপুর।

শিক্ষা ও সাংগঠনিক জীবন

জহিরুল ইসলাম যাদৈয়া মাদরাসা থেকে ২য় বিভাগে দাখিল ও আলিম পাশ করেন। লক্ষ্মীপুর মাদ্‌রাসাই আলীয়া থেকে ফাজিল ও কামিলে ২য় শ্রেণি লাভ করেন। যাদৈয়া মাদ্‌রাসায় পড়ালেখা করা সময়েই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালে ছাত্র শিবিরের সদস্য হন। লক্ষ্মীপুর জেলা শিবিরের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করে দুই বছর। ১৯৯৬ সালে ছাত্র জীবন শেষ করেন।

কর্মজীবন

মাওলানা জহিরুল ইসলাম ২০০১-২০০৮ সাল পর্যন্ত ইবনে সিনা হাসপাতালে প্রথমে পাবলিক রিলেশন এক্সিকিউটিভ পরে সহকারী ম্যানেজার পদে চাকুরী করেন। বর্তমানে লক্ষ্মীপুর মানারাত হাসপাতাল লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এম.ডি) হিসাবে চাকুরীরত। অপর দিকে লক্ষ্মীপুর ঐতিহ্য হোল্ডিংস এর চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ

লক্ষ্মীপুর ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ভাইস চেয়ারম্যান। জকসীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এর সিনিয়র সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বাংগা খা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সভাপতি। বাংগা খা হাইস্কুল সংলগ্ন মসজিদের খতিব। ছাত্র জীবন শেষ করেই জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সদস্য হন। কিন্তু নানা দূর্বলতা ও সমস্যার

www.pathagar.com

কারণে দীর্ঘদিন পর ১৯১৩ সালে জামায়াতের রুকন হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। বর্তমানে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের সহ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইসলামী আন্দোলনে পরীক্ষা অনিবার্য

লক্ষ্মীপুরের ইসলামী আন্দোলন তার অনিবার্য পরীক্ষা থেকে মুক্ত নয়। ১৯৯৫ সালে ক্ষমতাসীন দল বি.এন.পি জামায়াতকে রাজনৈতিক ভাবে চাপের মধ্যে রেখে চিরাচরিত অভ্যাস কার্যকরী করে ফায়দা অর্জন করতে চায়। তাদের মদদ পুষ্ট ছাত্র সংগঠন সুযোগ পেলেই ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর আঘাত হানতে দিধা করেনা। অথচ জামায়াত শিবিরের সহযোগিতা নিয়ে তারা ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করেছে বারবার। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরের তিন তারিখে বিনা উস্কানিতে ছাত্রদলের আক্রমনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মীদেরকে রক্ত ঝরাতে হয়েছে। লক্ষ্মীপুরে নিহত ও আহত হওয়ার মাধ্যমে রক্ত দেয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

তান্ডবলীলা শুরু

১৯৯৫ সালে ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ছাত্র দল একটি মিছিল বের করে। ছাত্রদলের মিছিলটি শিবির ধর জবাই কর, শিবিরের আস্তানা ভেঙ্গে দাও জালিয়ে দাও ইত্যাদি উত্তেজনাকর শ্লোগান দিয়ে শহর প্রদক্ষিন করছে। মিছিল উত্তর দিকে যাওয়ার সময় চক বাজারে অবস্থিত শিবির অফিসের ওয়ালে বোমা নিক্ষেপ করে। খবর পেয়ে শিবিরের জেলা সেক্রেটারী মাওলানা জহিরুল ইসলাম অফিসে গিয়ে দেখে ১৫/২০জন শিবির কর্মী উদ্বেগজনক অবস্থায় কথাবার্তা বলছে। কিছুক্ষণ পরই বি.এন.পি এর বিশাল জঙ্গি মিছিল দক্ষিন দিকে আসছে বলে জানা গেল। শিবির অফিস অতিক্রম করার সময় মিছিলের পিছনের দিকের অংশে অবস্থান কারী চিহ্নিত কিছু সন্ত্রাসী ক্যাডার শিবির অফিসকে ঘিরে সংগবদ্ধ আক্রমন চালায়। ইট পাটকেল ও বোমার আঘাতে মুহূর্তেই অফিস চত্বর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের লীলাভূমিতে পরিনত হল। মুহুর্মূহু বোমার আঘাতে অফিসের দরজা জানালা ভাংচুর করে। জেলা সেক্রেটারী এক পর্যায়ে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সকলে মুকাবেলা শুরু করে। ফজলে এলাহী, আবদুর রহমান, ইসমাইল হোসেন, এনায়েত, হাসনাত, ফয়সাল, বাবলু, ফরহাদ সহ সাহসী সৈনিকদের ভূমিকায়

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফজলু ও সাবেক জেলা সভাপতি নাছির উদ্দিন মাহমুদ সহ সকলে মিলে তাদেরকে ধাওয়া করে। কিন্তু ফিরে আসার সময়ই সন্ত্রাসীরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ ফজলে এলাহীকে আটক করে ফেলে উপর্যোপরী আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। মুমূর্ষূ অবস্থায় জেলা সেক্রেটারী জহিরুল ইসলাম নিজে রিক্সা চালিয়ে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় ফজলে এলাহীকে।

রক্তে ভেজা সদর হাসপাতাল

জহিরুল ইসলাম ফজলে এলাহীকে নিয়ে হাসপাতালে অবস্থান করার সময় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আবার সেখানে হামলার আশংকার কথা শুনতে পায়। কিন্তু ফজলে এলাহীর কলিজা বিদীর্ণকারী গোঙ্গানীর অবস্থায় জহিরুল ইসলাম হাসপাতাল ত্যাগ করতে বিবেকে দিল না। তার ধারণা ছিল এরই মাঝে হয়ত তার সাথীরা হাসপাতালে এসে যাবে। কিন্তু তারাও আসেনি। খুনের নেশায় ছাত্র দলের ঘাতকেরা তাদের হিংস্র ছোবল নিয়ে পিছনের দিক থেকে হাসপাতালে হামলা চালায়। তখন সময় রাত ৮টা। বোমার বিকট শব্দে হাসপাতালে বেডের অসহায় রোগীরা বুকফাটা চিৎকারে আর্তনাদ করে উঠেন। হাসপাতালের আসবাবপত্র, জানালার কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। আবাসিক মেডিকেল অফিসার জেলা সেক্রেটারী জহিরুল ইসলামকে তার রুমেই চুপচাপ থাকতে বলে। দায়িত্বে নিয়োজিত ডাক্তারগণ বাধা দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের দ্বারা চরমভাবে লাঞ্চিত হয়। সন্ত্রাসীরা আবাসিক মেডিকেল অফিসারের কক্ষে তল্লাসী করে শিবির সেক্রেটারী জহিরুল ইসলামকে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়ে। সেখান থেকে তাকে টেনে হেঁচড়ে বের করে রড, হকিষ্টিক, লাঠি, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে ইচ্ছামত আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। দুই পা ও বাম হাতের হাড় ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করে ফেলে। অস্ত্রের আঘাতে সারা শরীর জর্জরিত হয়ে যায়।

ঢাকায় প্রেরণ ও চিকিৎসা

ফজলে এলাহী ও জহিরুল ইসলামের অবস্থা আশংকাজনক। জামায়াত শিবিরের নেতৃবৃন্দ ডাক্তারের পরামর্শের আলোকে সিদ্ধান্ত নিল তাদেরকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিতে হবে। উভয়কে এম্বুলেন্সে উঠান হল। সাথে যাবেন জেলা জামায়াতের মজলিশে শুরা সদস্য ক্যাপ্টেন (অব:) আবদুর রহমান ও শিবির নেতা মুহাম্মদ নুরুল হুদা। হঠাৎ দেখা গেল ফজলে এলাহীর সেলাইন বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার এসে হার্ট

www.pathagar.com

ধরে চুপ হয়ে গেলেন এবং ফজলে এলাহীকে নামাতে বললেন। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য, না দেখলে লিখে বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। ফজলে এলাহীকে গাড়ী থেকে নামানো হলো। জহিরুল ইসলামকে সকলের চোখের পানি দিয়ে বিদায় দিল। সাথে যাওয়া নেতৃবৃন্দ তাকে ঢাকা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইদ্রিস আলীর তত্বাবধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। তিন মাস সতের দিন চিকিৎসার পর শিবির নেতা মোটামুটি সুস্থ্য হয়ে লক্ষ্মীপুর ফিরে আসেন। আল্লাহর পথে এই রক্তদান কে দ্বীন কায়েমের জন্যে শক্তিতে পরিনত করুন। জহিরুল ইসলাম আহত হওয়া ও ফজলে এলাহীর শাহাদাতে গোটা জেলায় ব্যাপক ভাবে আলোচনা সভাসহ দোয়ার অনুষ্ঠান হয়।
এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। এ রক্ত দানের ফলে আন্দোলন বেগবান ও শক্তিশালী হয়। শহীদ ও গাজীর রক্ত বৃথা যেতে পারেনা।

ছাত্র নেতা মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম

আল্লাহর পথে রক্ত ঝরিয়ে আত্মতৃপ্ত

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম ১৯৭৬ সালের ৫ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মুহাম্মদ হানিফ ও মাতা রোকেয়া বেগম জীবিত নেই। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সামছুল ইসলাম সবার বড়।

পড়ালেখা ও কর্মজীবন

এস.এস.সি ১ম বিভাগ ও এইচ.এস.সি ২য় বিভাগে পাশ করেন। বি.এস.এস, এম.এস.এস ও বি.এড ২য় শ্রেণি লাভ করেছেন। পড়ালেখা শেষ করে দুই বছর হলিহার্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি লক্ষ্মীপুর আধুনিক হাসপাতালে মার্কেটিং ইনচার্জ হিসাবে চাকুরীরত। অপর দিকে ঐতিহ্য এগ্রোফিসারিজ এর প্রকল্প পরিচালক।

www.pathagar.com

রক্ত ঝরার দিনটি

লক্ষ্মীপুরে ত্রাসের রাজত্ব চলছে। আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ গোটা প্রশাসনযন্ত্র। কেউ তাদের বিরুদ্ধে বলার সাহস নেই। এমন কি আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা ডাঃ আবুল বাসার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বাকরুদ্ধ। গড ফাদার ও তার বাহিনীর অস্ত্রের ঝনঝনাণী ও গোলাবারুদের গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে হামলা মামলার ভয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীরা সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকত। ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ধৈর্যের সাথে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। এর পরও তাদের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হলোনা।

১৯৯৯ সালের ১৫ আগষ্ট ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীদের থেকে ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা একটি সাইকেল ছিনিয়ে নেয়। সাইকেল ফেরৎ দেয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে সরল বিশ্বাসে শিবির নেতা মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম, মিজানুর রহমান মোল্লা ও বাহার লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ হোস্টেলে যাওয়ার পর তাদেরকে আটকিয়ে ফেলে। রাত ১০টায় শিবির নেতৃবৃন্দকে মারধর করে পিছনের দিকে হাত বেঁধে মটর সাইকেলে তুলে তিন জনকেই নিয়ে যায় মেঘনা রোডে। সেখানে নিয়ে শিবির নেতৃবৃন্দকে যে ভাবে নির্যাতন করেছিল, হিংস্র পশুও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য। ছাত্র নেতা সামছুল ইসলাম শহরের প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে। তার প্রতি আক্রোশ ছিল বেশী। তাকে করই গাছের দুই ডালের মাঝখানে মাথা রেখে জবাই করতে উদ্ধত হল। আবার মনে হলো দাঁড় করিয়ে গুলি করবে। এর কোনটাই না করে পরে সামছুল ইসলামকে গাছের সাথে বেঁধে হাতে পয়ে তার কাটা মেরে অমানবিক নির্যাতন করে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। অপহরণের খবর জেলা জামায়াত অফিসে আসল। তখন আমি (লেখক) পুলিশ প্রশাসনকে জানালাম। মজলুমদেরকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ সেদিন যে ভূমিকা পালন করেছিল, সেজন্য আমরা তাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। পুলিশ অনেক খোঁজাখুজির পর শিবির নেতৃবৃন্দকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে শামসুল ইসলামের অবস্থা ছিল আশংকাজনক। দারুল আমান একাডেমীতে জেলা জামায়াত অফিসে যখন সামছুল ইসলামকে নিয়ে আসা হয়, তখন তার আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়। কোন পাষাণ হৃদয়ের মানুষ এ অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। সন্ত্রাসী ও মানবতা বিরোধী এ ধরনের পশুত্বকে ঘৃণা না করে পারেনা।

www.pathagar.com

চিকিৎসা

মুহাম্মদ সামছুল ইসলামকে দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় পরের দিন নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় তিন মাস চিকিৎসাধীন ছিল। এরপর আরো ও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেও প্রায় দুই মাস চিকিৎসার পর মোটামুটি সুস্থ্য হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর আল্লাহ তাঁকে সুস্থ্য করেন। সে জন্য মহান আল্লাহর কাছে অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরবর্তীতে সে ইসলামী ছাত্র শিবিরের লক্ষ্মীপুর জেলা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্মীপুর শহর সাংগঠনিক থানার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। যে রক্ত তিনি ইসলামী আন্দোলন করার কারণে ঝরিয়েছেন, আদালতে আখেরাতে নাজাতের জরিয়া হিসাবে সে রক্তকে কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি।

মাওলানা সফিকুল ইসলাম

সাহসী, পরিশ্রমী ও স্পষ্টভাষী বান্দাহ

আল্লাহর সৃষ্ট সেরা জীব মানুষ। মানুষ শ্রেষ্ঠ তারাই যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আর আল্লাহর বান্দাকে সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য জান ও মালের কুরবাণী পেশ করতে হয়। এই কারণেই ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে অনেকের রক্ত ঝরেছে। আমরা মনে করি এই রক্তের বদলা আখেরাতে পাওয়া যাবে। এই কাঙ্খিত আশাকে লালন করেই রক্ত দিয়েছেন মাওলানা সফিকুল ইসলাম

জন্ম ও শিক্ষা

মাও: সফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের দুই তারিখে কমলনগর উপজেলার পশ্চিম চরলরেন্স গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মুহাম্মদ জবি উল্লাহ বয়সে এখন বৃদ্ধ। মাতা রাবেয়া খাতুন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। ৫ ভাই ৪ বোনের মধ্যে তিনি সকলের বড়। লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল এবং নোয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা সফিকুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ ইসলামী ছাত্র শিবির লক্ষ্মীপুর পৌরসভার সেক্রেটারী ছিলেন। শিবিরের সদস্য প্রার্থী অবস্থায় ছাত্র জীবন শেষ করেন। ছাত্র জীবন শেষ করেই বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৯৩ সালে জামায়াতের সদস্য (রুকন) হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে শহর জামায়াতের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর একটি ওয়ার্ডের তারবিয়ত সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কর্মজীবন

মাওলানা সফিকুল ইসলাম ছাত্র থাকাকালীন সময়েই লক্ষ্মীপুর পি.টি.আই জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। ১৯৯৩ সালে কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটির অর্থায়নে কামরা মুহাম্মদ আশুর (দারুল আমান একাডেমী) জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাওলানা সফিকুল ইসলাম এই মসজিদের খতিব নিযুক্ত হন। অপর দিকে ইসলমী ব্যাংক ফাউন্ডেশন উন্নয়ন ইউনিট কমিটির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কমিটির মাধ্যমে ব্যাংক এর অর্থায়নে সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম পরিচালিত হত। হকার্স মার্কেটে ছোট খাট একটি কাপড়ের দোকান ছিল। অল্প আয়ের সংসার হিসাব নিকাস করেই চলতেন তিনি।

১৯৯৯ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থিক সমস্যার কারণে মাওলানা সফিকুল ইসলাম সৌদি আরব যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেখানে গিয়ে তিনি দোকানে চাকুরী নেন। পরবর্তীতে তিনি জনাব শহীদ উল্লাহ, ফারুক হোসেন নূর নবী, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ্ সহ কয়েকজনে শিকড় প্রপার্টিজ লিঃ নামে একটি হাউজিং কোম্পানী গঠন করেন। বর্তমানে তিনি এই কোম্পানী গ্রুপের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

রক্ত ঝরার বিবরণ

১৯৯৯ সালে লক্ষ্মীপুর জেলা বিশেষ করে জেলা শহর গডফাদারের সন্ত্রাসী বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে মৃত্যু উপত্যকায় পরিনত করে। জামায়াত ও শিবিরের নেতা

www.pathagar.com

কর্মীরা তাদের নির্যাতনের টার্গেটে পরিনত করে। মাওলানা সফিকুল ইসলাম সংগঠনের সক্রিয় নেতা হিসাবে তাদের তালিকাভূক্ত ছিল। অস্ত্রধারী বাহিনী লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ সহ বিভিন্ন পয়েন্টে মহড়া দিত। কোন দিন কে কোথায় আক্রান্ত হবে সেটা নিয়ে মানুষের চিন্তার অন্ত ছিলনা। ১৯৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের সময় ১৫/২০ জনের একটা বাহিনী শর্টগান, এল.জি. হকিষ্টিক চাইনিজ কুড়াল সহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে গো হাটা রোডে আসল। পেয়ে গেল তাদের কাঙ্খিত ব্যক্তি মাওলানা সফিকুল ইসলামকে। আর যায় কোথায় তারা ঝাপিয়ে পড়ল সফিকুল ইসলাম এর উপর। সঙ্গে ছিল তার ছোট মেয়েটি। কত নির্মম ও নিষ্ঠুর মেয়েটির প্রতি ও তাদের স্নেহ মমতা ছিলনা। সফিকুল ইসলাম একাকী মুকাবিলা শুরু করলেন। ছিনিয়ে নিলেন তাদের একটি হকিষ্টিক। মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে সাহসীকতার সাথে হাত ও পায়ের ব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা তার চারদিক থেকে ছিটকে পড়ল। অবশেষে টার্গেটকে কাবু করতে না পেরে টেনে হেঁচড়ে এরশাদ ভিলা মসজিদের নিকট নিয়ে যায়। ইচ্ছা ছিল জায়গা মত নিয়ে তাদের রক্তের পিপাসা পূরণ করবে। তাও তাকে ধরে রাখতে পারলনা। তাদের হাত থেকে ছুটে দারুল আমান একাডেমীর রাস্তা দিয়ে দৌড় দিল। তখন তাকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা শর্টগানের গুলি চালাল। মাথায় গুলির প্রচন্ড আঘাতে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। তখন মনে করেছিলেন, তিনি আর বাঁচবেন না। কিন্তু সন্ত্রাসীরা আর সামনের দিকে এগুলো না। ইতি মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সাথীরা খবর পেয়ে এগিয়ে গেল। নিয়ে আসলেন ক্ষত বিক্ষত গুলিবিদ্ধ সফিকুল ইসলামকে। রাখলেন শহীদ আহমদ জায়েদের ঘরে। এ অবস্থায় তাঁর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়। ১৫/২০ মিনিট সফিকুল ইসলাম একাকী সন্ত্রাসী বাহিনীর মুকাবিলা করেছিলেন। এটা আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদ ছাড়া সম্ভব নয়।

লক্ষ্মীপুরে চিকিৎসার পর ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল মতিঝিল শাখায় ভর্তি হয়। দীর্ঘ এক মাস চিকিৎসার পর সফিকুল ইসলাম মোটামুটি সুস্থ্য হলেন। সকলেই মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। আমরা দোয়া করছি। আল্লাহ যেন আখেরাতের হিসাব নিকাশের কঠিন সময় তার এই রক্ত দান কে নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। গোটা পরিবারকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমিন!

www.pathagar.com

শিবির নেতা মুহাম্মদ নূর নবী

মেধাবী সৈনিকের কুরবাণী

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

মুহাম্মদ নূর নবী ১৯৭৬ সালের ২৬ আগষ্টে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আবদুল হাই চৌধুরী অবসর প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত আছেন। মাতার নাম হাবিবা খাতুন। তিন বোন, তিন ভাই। তিনি ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ ও ভাইদের মধ্যে বড়।

শিক্ষা জীবন

মুহাম্মদ নূর নবী দাখিল ও আলিম ১ম বিভাগে পাস করেন। ফাজিল ও কামিল এ (আরবী সাহিত্যে) চন্দ্রগঞ্জ কারামতিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১ম শ্রেণি লাভ করেন। খলিলুর রহমান ডিগ্রী কলেজ থেকে ২য় বিভাগে বি.এ. (পাস) করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এম.এ. ২য় শ্রেণি লাভ করেন। একজন প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

কর্মজীবন ও সাংগঠনিক দায়িত্ব

তিনি বর্তমানে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ এর ময়মনসিংহ শাখা ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত আছেন। সাংগঠনিক জীবনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের চরশাহী জোন সভাপতি, চন্দ্রগঞ্জ কারামতিয়া আলীয়া মাদরাসার সভাপতি, চন্দ্রগঞ্জ সাথী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সর্বশেষ চন্দ্রগঞ্জ সাথী শাখা সভাপতি থেকে সাংগঠনিক ও ছাত্র জীবন শেষ করেন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহর শাখার সাথে কাজ করছেন।

রক্ত ঝরার সেই দিনটি

১৯৯৯ সালে লক্ষ্মীপুর জেলায় গড ফাদার বাহিনীর সদস্যরা তান্ডব চালিয়ে জনগনকে জিম্মি করে রেখেছিল। হত্যা, ত্রাস, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ওদের নেশা হয়ে যায়। এমন ঘটনাও আছে চাঁদা না দিয়ে কোন বর তার নববধুকে ঘরে তুলে নেয়া সম্ভব হত না। ভয়ে বিয়ে সাদীর কোন অনুষ্ঠান করতে সাহস পেতনা। ছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসায় যাওয়া অনেকেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। কারণ আওয়ামী ছাত্রলীগের বদনজরে কোন ছাত্রী পড়লে তার নিস্তার ছিলনা। লক্ষ্মীপুর

www.pathagar.com

শহরে মাগরিবের পর দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত। সূর্য অস্তমিত হওয়া মানেই ছিল লক্ষ্মীপুর মৃত্যুপুরী।

সেই দিনটি ছিল ১৭ আগষ্ট ১৯৯৯ সাল সকাল ১১টা। লক্ষ্মীপুরে গডফাদারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল পরবর্তী চক বাজার চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পর ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মীরা যখন গো হাটায় আসে তখন কিছু বুঝার আগেই গড ফাদারের অস্ত্রধারী বাহিনী ইসলামী ছাত্র শিবিরের নিরস্ত্র কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগ্নেয়াস্ত্র, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, হকিষ্টিক দিয়ে আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় শিবির কর্মীরা। এ সময় শিবির নেতা নূর নবীর ডান হাতের কব্জিতে বুলেট বিদ্ধ হলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে ১০/১২জন সন্ত্রাসী এসে তার উপর হায়েনার মত আক্রমন করে। মাথায় রামদা দিয়ে মারাত্মক ভাবে জখম করে। ডান হাত সহ পায়ে ১০/১২টি কোপ দেয়। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। মৃতপ্রায় অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। সে বাঁচবে এটা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। কিন্তু এর পরও সংগী সাথীরা চেষ্টার কোন ত্রুটি না করে ঢাকায় নিয়ে যায়। ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দশ বেগ রক্ত দেয়ার পর নূর নবীর জ্ঞান ফিরে আসে। মাথায় ৫৪টি সেলাই করতে হয় । আর ও আহত হয় ২৫/৩০ জন। তারা হল নাছির, জাহাঙ্গীর, আলমগীর, ফয়সাল সহ অনেকেই। লক্ষ্মীপুর গোহাটার পিচ ঢালা রাস্তায় শহীদ আর গাজীদের রক্ত দেয়ার ইতিহাস ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা তথা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এই গোহাটা ময়দানেই বক্তব্য রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তাই মহান আল্লাহর দরবারে কামনা করছি, এ এলাকাকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ঘাটিতে পরিনত করুন। আমিন !

www.pathagar.com

ইয়াতিম সামছুল ইসলাম
আখেরাতেই পুরস্কারের আকাঙ্খী

এক ভাই দুই বোন। তার নাম হচ্ছে সামছুল ইসলাম। ছোট একটি ঘর সামান্য একটু জমি। কি দিয়ে সংসার চলবে? উপার্জনের কেউ নেই। তাই দশ বছর বয়সেই ইয়াতিম খানায় চাকুরী নিল। দারুল আমান একাডেমী ইয়াতিম খানার হাড়ি পাতিল ধৌত করছে সামছুল ইসলাম। দু'মুঠো অন্ন যোগাবে নিজের জন্য। কোন বেতন নির্ধারিত হয়নি। মাকে দিবে কিভাবে। নিরীহ ও সৎ ছোট ছেলেটি অনেক কষ্ট করে বড় বড় পাতিল থালা বাসন ধৌত করত।

তবুও কারো কাছে দু:খ কষ্টের কথা বলতনা। জামায়াতে ইসলামী লক্ষীপুর জেলা জামায়াতের দায়িত্ব তখন আমার (লেখক) উপর অর্পিত। জেলা সংগঠন ইয়াতিমখানা পরিচালনা করছে। সেই সুবাদে ছোট ছেলে সামছুল ইসলামের হাঁড়িপাতিল ধৌত করা এবং পাকের কাজে সাহায্য করার কষ্ট আমি অনুভব করছি। তাই আমি একদিন সামছুল ইসলামকে ডেকে বললাম আগামী মাসের ১ তারিখ থেকে তুমি আমাদের জেলা জামায়াত অফিসে পিয়ন হিসেবে কাজ করবে। ইয়াতিম খানায় অন্য লোক নিয়োগ করা হবে। শুনে খুশী হয়ে গেল সামছুল ইসলাম। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে জেলা শুরাতেও পরামর্শ করেছি। সংগঠনের পক্ষ থেকে যা বলা হয় তাই করার জন্য চেষ্টা করে সামছুল ইসলাম। কিন্তু সেদিন কি কেই জানত এই অফিস পাহারা দিতে গিয়ে তাঁর রক্তে লাল হয়ে যাবে অফিসের কক্ষটি?

ভয়াল রাতের বিভীষিকা

২০০০ সালের ২ জুলাই রাত আনুমানিক ১২ টায় ৪/৫টা মটর সাইকেল নিয়ে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দারুল আমান একাডেমী সংলগ্ন জিলা জামায়াত অফিসে অবস্থানকারী সামছুল ইসলামের উপর হামলা চালায়। তখন জেলা আমীর ছিলেন জনাব হাসানুজ্জামান। অফিসের নিকটবর্তী মসজিদে

www.pathagar.com

তোফায়েল আহমদ (খোকা) নামের এক ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। সামছুল ইসলামের আর্তনাদে সে ঘুম থেকে জেগে যায় এবং দৌড়ে গিয়ে আমাকে জানায়। আমি দ্রুত অফিসে গিয়ে যা দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সমস্ত অফিসের ফ্লোর রক্তে লাল হয়ে আছে। পা রাখার মত কোন যায়গা ছিলনা অফিসে। তখন সামছুল ইসলামও অফিসে ছিলনা। অফিসের পিছনের জানালা দিয়ে দক্ষিণ পাশের বাড়ীতে চলে গেছে।। কিন্তু কিভাবে সে ঐ বাড়ীতে গিয়েছে তা সে বলতে পারেনি। সে বাড়ি থেকে তাকে ইয়াতিম খানায় নিয়ে আসা হলো। তাঁর হাত ও পায়ের হাড় ভেঁঙ্গে টুকরো করে ফেলেছে। একজন নিরীহ মায়ের একমাত্র ইয়াতিম ছেলেকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। সে আমাকে দেখে আর্তনাদ করে বলছে "স্যার আমি বাঁচবোনা .....। তাঁর আর্তনাদে কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারলোনা। রাত ১.৩০ মিনিটে আমি থানা, আধুনিক হাসপাতাল ও জনাব ডাক্তার ফয়েজ আহমদকে টেলিফোনে জানালাম। পুলিশের সহযোগিতায় সামছুকে আধুনিক হাসপাতালে নেয়া হলো। ডাঃ ফয়েজ আহমদ খবর পেয়ে রাত ২ টার পর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আধুনিক হাসপাতালে উপস্থিত হন। সামছুল ইসলাম ডাঃ সাহেবকে দেখেই চিৎকার করে বলল "স্যার গো আপনি এসেছেন?" ইতিমধ্যে সামছু এর শরীরের রক্ত প্রায় ঝরে গেছে। সৌভাগ্য বশতঃ হাসপাতালের কর্মচারী বেলায়েত হোসেন ও কামাল হোসেনের রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ হওয়ায় সামছুর রক্তের গ্রুপের সাথে মিলে যায়। সাথে সাথে তাদের থেকে ২ ব্যাগ রক্ত নিয়ে তাকে দেয়া হয়। এতে আল্লাহর মেহেরবানীতে আশংকাজনক অবস্থা থেকে সামছু রক্ষা পায়। ডাঃ ফয়েজ সাহেব হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আসে। তিনি বাসায় আসার পরপরই ডাঃ সাহেবকে খুঁজে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা হাসপাতালে ভাংচুর চালায়। পরদিনই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর মোটামুটি সুস্থ হয়ে

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুরে ফিরে আসে। দারুল আমান মাদ্‌রাসার একজন ছাত্র হেলাল উদ্দিন ঢাকায় সামছুর নিকট থেকে সেবা যত্ন করে অসামান্য অবদান রাখেন।

কি অপরাধ ছিল এ নিরীহ ইয়াতিম সন্তানের? তাঁর একটি মাত্র অপরাধ ছিল সে একটি ইসলামী আন্দোলনের অফিস পাহারা দিচ্ছে। আল্লাহ তাঁর এই রক্ত দানকে পরকালে নাজাতের ওয়াসিলা হিসাবে কবুল করুন। বর্তমানে সে ইসলামী আন্দোলনের শপথের কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। বৃদ্ধা মা এখনও বেঁচে আছেন। বর্তমানে সামছুল ইসলাম এক সন্তানের পিতা হয়েছে। এখনও অভাব অনটনের মধ্যেই সংসার চলছে। আমরা তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করছি। আমিন!

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- ইসলামী আন্দোলনে দায়িত্বশীলদের করণীয়
- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মান উন্নয়ন সহায়িকা
- লক্ষ্মীপুরে যারা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক
- স্মৃতিতে ভাস্বর ইকামতে দ্বীনের জন্য অনুকরণীয় (পাণ্ডুলিপি)
- আত্মজীবনী (পাণ্ডুলিপি)